বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০২৪

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের
শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি
২০২৪

People Change the World Diakonia

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০২৪

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
৬/৫ এ, স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট : www.safetyandrights.org

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৫

স্বত্ব
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

আলোকচিত্র
ইন্টারনেট

দাম
১০০ টাকা

The State of Labour and Labour Economy of Bangladesh 2024

Documentation, Editing and Publication
Safety and Rights Society (SRS)
6/5 A, Sir Syed Road (1st Floor)
Mohammadpur, Dhaka-1207
Mobile : +88 01974666890
info@safetyandrights.org
safetyandrights.org
Safety and Rights Society
Safety and Rights Society

Date of Publication
January 2025

Price
100 Tk.

Copyright
Safety and Rights Society (SRS)

ISBN : 978-984-35-7042-0

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

সুচিপত্র

সম্পাদকীয় : অর্থনৈতিক মন্দার শঙ্কা নিয়ে নতুন বছরে প্রবেশ করছে শ্রমজীবীরা □ ০৫

সুন্দর একটা কর্মজীবন চাইতে যেয়ে শহীদ হলেন আবু সাঈদ □ ০৭

চাকুরিতে নিয়োগে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান □ ০৯

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত পোশাক শ্রমিকদের তালিকা প্রকাশ ও পুনর্বাসনের দাবি □ ১১

বাংলা বসন্তে ২৬ জন রিকশাচালকও জীবন দিয়েছেন □ ১৩

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান : এক তরুণের জীবন বাঁচাতে একজন রিকশা শ্রমিকের প্রচেষ্টা যেভাবে নজর কাড়লো □ ১৫

অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ৩০ সেপ্টেম্বর : শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি'র বিবৃতি □ ১৭

শ্রম আইন সংশোধনে আন্তর্জাতিক পরিসরে অঙ্গীকার করলো বাংলাদেশ □ ১৮

প্রশিক্ষণবিহীন বিপুল বেকার; দ্রুত কয়েক লাখ কর্মসংস্থান কি সম্ভব? □ ২০

ডাবল ডিজিট মূল্যস্ফীতি; শ্রমিক জীবনে নাভিশ্বাস দারিদ্র্য ঝুঁকিতে অদরিদ্ররাও □ ২৩

মিরণজিল্লার দলিতদের ভূমির আন্দোলন নজর কাড়লো দেশব্যাপী : জাতীয় সংস্কার ভাবনায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বৈষম্যও দূর করার দাবি □ ২৬

বাড়ছে বজ্রপাত : ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ক্ষেতমজুর ও জেলেরা □ ২৯

শোভন কর্ম পরিবেশের জন্য দরকার ইটিপি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাধ্যবাধকতা □ ৩১

গণঅভ্যুত্থানের পর ওষুধ শিল্পে মজুরি বাড়াতে শ্রমিক আন্দোলন □ ৩৩

জাভেদ ও চম্পা:বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিক বৈষম্যের দুই মেরু □ ৩৫

২০২৪ এর জন্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ৯ শতাংশের ঘোষণায় অসন্তুষ্ট পোশাক শ্রমিকরা □ ৩৭

বির্তকের মুখে ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিরা: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা জারি □ ৩৮

চামড়া খাতের ২০২৪-বাজার খারাপ; রফতানি কম;প্রণোদনাও কমলো; শ্রমিকদের মজুরিও বাড়েনি □ ৪০

শ্রম আইন ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ চাইছেন গিগকর্মীরা □ ৪৩

নির্মাণ শ্রমিক □ ৪৬

বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়িয়েও প্রবাসী শ্রমিকরা বাড়তি কোন সুবিধা পাচ্ছেন না □ ৪৮

শ্রমজীবী মায়েদের সন্তানদের জন্য এসআরএস এর চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট সেন্টার □ ৫০

Editorial Workers Entering the New Year with Concerns of Economic Recession □ 51

Compulsory ETP and waste management needed for decent work environment □ 53

Javed and Champa: Two sides of owner-worker disparity in Bangladesh □ 55

Double-digit inflation: Workers' struggles; even the non-poor at risk of poverty □ 58

Labour migration declines, remittance increases in 2024 SRS reports □ 60

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক মন্দার শঙ্কা নিয়ে নতুন বছরে প্রবেশ করছে শ্রমজীবীরা

সেফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) এর পক্ষ থেকে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। কিছু দিন আগেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ৫৪ বছর এবং আমাদের সংগঠন তার পথ চলার ১৫ বছর অতিক্রম করেছে। একই সঙ্গে বিগত বছরে বাংলাদেশ এক গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে ২০২৫ এ পদার্পণ করলো।

একটা দেশের জীবনে পাঁচ দশক এবং একটা বেসরকারি সংগঠনের পথ পরিক্রমায় দেড় দশক কম সময় নয়। খুব দরিদ্র ও বিধ্বস্থ এক অবস্থা থেকে বাংলাদেশ উঠে দাঁড়িয়েছিল। আর এসআরএসের জন্ম খুবই সামান্য সহায়তা নিয়ে। বাংলাদেশের দরকার ছিল দারিদ্র্যমুক্তি আর সমৃদ্ধি। অন্যদিকে, আমাদের লক্ষ্য ছিল দেশের সমৃদ্ধি ও নিজেদের রুজিরোজগারে কাজ করে যাওয়া বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখা।

কোন সংগঠনই তারা চারপাশের পারিপার্শ্বিকতা অবজ্ঞা বা অতিক্রম করে এগোতে পারে না। আর্থ-সামাজিক পরিবেশই একটা বেসরকারি পরিবর্তনকামী সংগঠনের কাজের পরিসর ঠিক করে দেয়। এসআরএসও তার ব্যতিক্রম নয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। সম্পদশালী বিশাল একটা জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। বড় আকারের এক ক্রেতা সমাজ এখানে বিপুল হারে পণ্য চাহিদা বাড়িয়ে চলেছে। এসবের ফল হিসেবে ক্রমে বাড়ছে এখানকার শ্রমখাতের আকার। ৬-৭ কোটি মানুষ এখন সরাসরি শ্রম বিক্রি করে চলছে। পাশাপাশি আবার এও দেখছি আমরা, উপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আইনী কাঠামোর বেশ সামান্যই এখানে সংস্কার হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে মিলে শ্রমজীবীদের কাজের গণতান্ত্রিক আবহ তেমন আশাপ্রদ নয় আজও। আজও শ্রমজীবীদের জীবনধারা বেশ অসন্তোষজনক। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশে শোভন কাজের পরিবেশ নিয়ে আরও বহু কিছু করার ছিল এবং করার আছে। বাংলাদেশের বড় এক জাতীয় লক্ষ্য

দারিদ্র্যমুক্তি হলেও শ্রমিক পরিবারগুলোকে এখানে এমন কাজের সুযোগ দেয়া যায়নি যে, তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে দ্রারিদ্র্য অবস্থা থেকে নিশ্চিন্তে এগোতে পারে। এসআরএস ঠিক এখানে সরকার ও শ্রমজীবী উভয় জনগোষ্ঠীর সহায়ক শক্তি হিসেবে তার ক্ষুদ্র অবদান রাখতে চেয়েছে। এখনও আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য এটাই– আগামীতেও তাই থাকবে। আমরা মূলত লড়ছি বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে। আমরা মনে করছি এখানে শ্রমজীবীদের সন্তুষ্টি গণতন্ত্রের শেকড়কে শক্তি যোগাবে। নিম্নবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনে স্বস্তি এলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা টেকসই হবে।

ঠিক এরকম বিবেচনা থেকেই আমরা প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ের শ্রমঅর্থনীতির পর্যালোচনা করে থাকি। বিগত বছরে শ্রমখাতের প্রধান প্রধান ঘটনা ও প্রবণতাকে শনাক্ত করার মাধ্যমে আমরা শ্রমিক সংগঠনগুলোর এবং সরকারের নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছি। অনেক বছর ধরেই আমাদের এই বাৎসরিক কাজ চলছে। যথারীতি এবছরও আমরা ২০২৪ এর শ্রম গতিশীলতার উপর এই সংকলন প্রকাশ করছি। খুব সঙ্গতকারণে এবারের সংকলনে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শ্রমজীবীদের অংশগ্রহণের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

২০২৪ এর এই গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত এখনও পুরোপুরি সংকলিত হয়নি। তার মাঝ থেকে চুম্বক কিছু বিষয় আমরা তুলে ধরেছি এই বিবেচনা থেকে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কারের যে আয়োজন চলছে তাতে যেন শ্রমজীবীদের প্রত্যাশাগুলো বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে শ্রম আইনের ব্যাপক সংস্কার দরকার দেশে। এখনও গৃহশ্রমিক, গিগকর্মীসহ বহু খাতের লাখ লাখ শ্রমজীবী শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত নয়। পুরানো শ্রম খাতগুলোর পাশাপাশি দেশে নতুন নতুন শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত করে শ্রম আইনেরও একটা অগ্রসর ও প্রগতিমুখী সংস্কার এখন জরুরি।

আবার শ্রমিকের মজুরি কাঠামো ঠিক করার যে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও সংস্থা রয়েছে সেগুলোরও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি কাঠামোর সমন্বয়ের স্থায়ী আইনগত ব্যবস্থাও দরকার বলে আমরা মনে করি। শ্রমিক সংগঠনগুলো বহুকাল ধরে এসব বিষয়ে এমন ধরনের সমাধান চাইছে যাতে তাদের রাজপথে নেমে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে এখন দেশের সকল পেশার মানুষের মতোই শ্রমজীবীদেরও অনেক চাওয়া। ইতোমধ্যে সরকার একটা শ্রম কমিশনও গঠন করেছে। এসআরএস এই কমিশনের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে এবং কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ইতোমধ্যে আমরা সুপারিশ তুলে ধরেছি। আমরা বিশেষভাবে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা বাড়াতে করণীয় বিষয়ে কিছু সুপারিশ তুলে ধরেছি সরকারের কাছে। আশা করি এই কমিশনের সুপারিশসমূহ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করবেন। চব্বিশের জুলাই-আগস্টের বৈষম্য বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করবে শ্রমজীবীদের জীবন কতটা বৈষম্যমুক্ত হচ্ছে তার উপর।

কিন্তু বছরটি শ্রমজীবীদের জন্য বেশ দুর্বিষহ ছিল। বিশেষ করে এ বছর লাগাতারভাবে দ্রব্যমূল্য ডাবল ডিজিটে অব্যাহত ছিল। এছাড়া গণঅভ্যুত্থানের সময় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের আয়রোজগার বাধা হয়েছিল পুনঃপুন। আবার আগস্ট থেকে শ্রমিক অঞ্চলে শুরু হয় ব্যাপক অস্থিরতা। অতীত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ট অনেক ব্যবসায়ী শিল্পপতি পালিয়ে গেছেন বা আটক হয়েছেন। সে কারণে বহু কারখানায় শ্রমিকরা সময়মতো মজুরি পায়নি। কোথাও কোথাও কারখান বন্ধ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। শ্রমিক এলাকাগুলোতে মাঝে মাঝে সহিংসতাও ঘটছিল।

সব মিলে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়টি শ্রমিকদের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠছিল। শ্রমজীবীরা আশা করছে শ্রম কমিশনের প্রতিবেদন চূড়ান্ত হলে তার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হবে এবং শিল্পাঞ্চলে স্বস্তি আসবে। তবে ইতোমধ্যে আইএমএফের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি তরফ থেকে বছর শেষে সামাজিক বিনিয়োগ কমতে থাকায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সংকুচিত হচ্ছিলো এবং শ্রম গতিশীলতা কমে যাচ্ছিলো। গ্রামে কাজ কমে যাচ্ছে বলে এসআরএস খবর পাচ্ছিলো। ন্যায্যদামে পণ্য বিক্রির আয়োজনও সরকার সীমিত করে ফেলেছে। অর্থনীতিতে মন্দার আভাস বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ধারণা করা যায় ২০২৫ শ্রমজীবীদের জন্য সুখকর হবে না বাংলাদেশে। তারপরও সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আশা করা ছাড়া, বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের জন্য নিশ্চিত কোন সুসংবাদ নেই আপাতত।

সেকেন্দার আলী মিনা

সুন্দর একটা কর্মজীবন চাইতে যেয়ে শহীদ হলেন আবু সাঈদ

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শত শত শহীদের মৃত্যুর ঘটনার মাঝে আন্দোলনকালে প্রথম দিকে ১৬ জুলাই রংপুরে আবু সাঈদ নামে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর শহীদ হওয়ার ঘটনা দেশব্যাপী বিশেষ আলোড়ন তোলে। ভিডিওতে দেখা যায় আবু সাঈদ একা দাঁড়িয়ে খোলা হাতে প্রতিবাদ জানানোর সময় উপর্যপুরি তার শরীরে গুলি এসে লাগে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় আবু সাঈদ মোটেই আক্রমণাত্মক কোন ভঙ্গীতে ছিলেন না। কিন্তু তাও গুলি করা হয়। আবু সাঈদ সম্পর্কে তার চাচাতো ভাই রুহুল আমীন ২৭ জুলাই প্রথম আলোতে লিখেছেন তাতে দেখা যায় কীভাবে একটা সুন্দর কর্মজীবনের স্বপ্ন এই শহীদকে জীবন দিতে রাজপথে টেনে নিয়ে গেছে:

> আবু সাঈদ আমার জেঠাতো ভাই। আমি ওর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। তবে বড় হলেও একসঙ্গেই আমাদের বেড়ে ওঠা। পীরগঞ্জের বাবনপুর গ্রামে আমাদের বাড়ি। আমাদের দু'জনের বাবাই বর্গাচাষি।...পরিবারের অন্য সদস্যদের মতো আমি আর সাঈদও দিনের পর দিন মাঠে কাজ করেছি।...খেতে কাজের কারণে আমরা বেশি খেলাধুলার সময়ও পেতাম না। এক পোশাকে দুতিন বছরও পার করেছি।
>
> ...আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকেই পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পায় সাঈদ। ক্লাস সিক্সে ওঠার পর গ্রামেই একটি টিউশনি জোগাড় করে। টিউশনির টাকা আর ওই বৃত্তির টাকা দিয়েই খাতা-কলম কিনত, পরীক্ষার ফি দিত। এসএসসি পাসের পর সাঈদ যখন রংপুর সরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়, আমি তখন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে পড়ি। সাঈদকে শহরের একটি মেসে তুলে দিই। একসময় অর্থের অভাবে ওর পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার জোগাড় হলে অনেক কষ্টে একটা টিউশনির ব্যবস্থা করি। সেই টিউশনির টাকায় নিজের ব্যয়ভার মেটানোর পাশাপাশি মা-বাবাকেও সহযোগিতা করতে থাকে সাঈদ।
>
> ...ওরা ছিল ৯ ভাইবোন। অভাবের কারণে বড় চার ভাইবোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পার করতে পারেনি। সাঈদের পিঠাপিঠি ভাই আবু হোসেন এইচএসসি পাস করে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। তাই আবু সাঈদকে ঘিরেই ছিল পরিবারের সবার আশাভরসা। সাঈদও তাদের মান রাখতে চেষ্টা করে যেতে থাকে। ছোট বোন সুমিকে পড়াশোনা করাতে এগিয়ে আসে।
>
> এইচএসসি পাস করার পর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকে আবু সাঈদ। আমার কাছে এসে কথায় কথায় বলত, ভাই, আমরা গরিব মানুষের ছেলেপুলে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। একটা সুন্দর কর্মজীবন লাগবে। কিন্তু বিধিবাম। প্রথমবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই ওর সুযোগ হলো না। তবে দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হলো না সাঈদ। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেল। বেছে নিল বাড়ির কাছের রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। পরের চারটি বছর সাঈদ আমার মেসেই ছিল। সাঈদের সঙ্গে আমার ছয় সেমিস্টারের পার্থক্য। এ জন্য অনার্সের কোনো বই তাকে কিনতে হয়নি। আমার বইগুলো নিয়েই পড়াশোনা করেছে।

...কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে তাতে জড়িয়ে পড়ে সাঈদ। কয়েক দিন পরে জানতে পারি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-ই অন্যতম সমন্বয়ক। যে রাতে দেশের সব ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে, সেই রাতে ওদের সঙ্গে আমিও মিছিলে ছিলাম। রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত মিছিল করলাম। পরদিন আমাদের মেসে 'ফিস্ট (ভোজ)' ছিল। সপ্তাহের এই একটা দিন আমরা ভালোমন্দ খাই। কাকতালীয়ভাবে এবার বাজারের দায়িত্বে ছিল সাঈদ। কিন্তু সে এসে আমাকে বলল, ভাই, আপনি একটু ম্যানেজ করে নেন। আমি আরও তিনজনকে নিয়ে গিয়ে বাজার করে আনলাম। সাঈদ ওর এক বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাল, সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করলাম।

১৬ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে মেস থেকে বের হয় সাঈদ। যাওয়ার সময় বলল, 'ভাই থাকেন, আমি যাচ্ছি।' আর জানাল, বেলা তিনটায় ওদের মিছিল, চাইলে আমিও শরিক হতে পারি। তারপর আমিও কাজে বেরিয়ে পড়ি। বেলা ৩টা ২০ মিনিটে খবর পাই, পার্কের মোড়ের অবস্থা খারাপ। আমার ভাইটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

ছুটে যাই হাসপাতালে। মর্গে ঢুকে দেখি, আমার ভাইয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে।...আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে গভীর রাতে সাঈদকে নিয়ে আমরা বাবনপুরের পথ ধরি। বিশাল গাড়িবহরের সঙ্গে যেতে যেতে মনে হলো, ছেলেটার কীভাবে বাড়ি ফেরার কথা ছিল আর কীভাবে ফিরছে। কথাটা ভাবতেই শরীরটা শিউরে উঠল, বুকের ভেতরটা দুমড়েমুচড়ে গেল।'

উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে আবু সাঈদ ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষায় পাস করেছেন বলে দেখা যায়। যে ফল প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। ১৪ অক্টোবর ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এতে উত্তীর্ণ হন ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, রংপুর বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া আবু সাঈদ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় ইবতেদায়ী জেনারেল শিক্ষক (ইংরেজি ও বাংলা বিষয়) পদে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। এই ফল ঘোষণার পর আবু সাঈদের পরিবার ও বন্ধুদের মাঝে পুনরায় বিশেষভাবে শোকের আবহ তৈরি হয়।

ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ বহুজন আবু সাঈদদের বাড়িতে যান। এই বাড়ি দীর্ঘসময় ধরে সারা দেশের মানুষদের নিয়মিত এক গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে এখন।

১০ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আবু সাঈদদের বাড়িতে যান। সেখানে যেয়ে তিনি বলেন, আবু সাঈদ এখন এক পরিবারের সন্তান নয়। বাংলাদেশের যত পরিবার আছে, তাদের সন্তান। যারা বড় হবে, স্কুল-কলেজে পড়বে, তারা আবু সাঈদের কথা জানবে এবং নিজে নিজেই বলবে, আমিও ন্যায়ের জন্য লড়ব। আবু সাঈদ এখন ঘরে ঘরে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবারই সন্তান আবু সাঈদ। হিন্দু পরিবার হোক, মুসলমান পরিবার হোক, বৌদ্ধ পরিবার হোক–সবার ঘরের সন্তান এই আবু সাঈদ।

আবু সাঈদের ভাইবোনদের জন্য চাকুরি

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আবু সাঈদের প্রতি নানান উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা এই পরিবারের তিনজনকে চাকুরি দিয়েছে।

আবু সাঈদের ছোট বোন সুমি খাতুনকে চাকরি দেয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) কর্তৃপক্ষ। এর পর আবু সাঈদের এক ভাই রমজান আলীকে কাজ দেয় বাংলাদেশ প্রতিদিন। তারা নিজেদের রংপুর ব্যুরো অফিসের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী হিসেবে তাঁকে এবং আরেক ভাই আবু হোসেনকে সহযোগী প্রতিষ্ঠান টিভি চ্যানেল নিউজ-২৪ এর রংপুর অফিসের জ্যেষ্ঠ নির্বাহীর পদে নিয়োগ দেয়।

চাকুরিতে নিয়োগে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান

২০২৪ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল সরকারি চাকুরি ব্যবস্থায় বিদ্যমান কোটার নিয়ম সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলন এবং তাতে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-জনতার নিহত হওয়া। জুলাই মাসের প্রথম থেকে এই আন্দোলন শুরু হলেও এতে সংঘাত, সংঘর্ষ ও নিহত হওয়ার ঘটনাগুলো ঘটে ১৫ জুলাইয়ের পর থেকে। এই আন্দোলন ৫ আগস্ট সফল গণঅভ্যুত্থান আকারে শেষ হলেও মানুষের মৃত্যুর প্রলম্বিত জের বইতে থাকে আগস্টের পরও।

এই আন্দোলন শুরু হয় যখন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের জন্য সরকারি চাকুরিতে ৩০ শতাংশ কোটার বিষয়সহ পুরানো কোটা ব্যবস্থা আবার পুনর্বহাল করে সরকারের এ সংক্রান্ত পুরানো পরিপত্র বাতিল করে দেয়।

প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল সরকার যেন এই রায় সংশোধনে উদ্যোগী হয়। তাঁরা চাকুরিতে শূন্যপদ মুখ্যত মেধার ভিত্তিতে পূরণের দাবি তোলেন। এ সময় বিভিন্ন ধরনের কোটায় অর্ধেকেরও বেশি পদ কোটা সুবিধাধারীরা পেতেন।

এক পর্যায়ে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের পক্ষে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসগুলো থেকে বেরিয়ে এসেও বিক্ষোভ করতে থাকে। ১৫ জুলাই এই আন্দোলন দমাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ব্যাপক হামলা হয়। পর দিন থেকে সরকার বিদ্যাপীঠগুলো বন্ধ করে দেয় এবং ছাত্রাবাসগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের বের হয়ে যেতে বলে। এসময় কোটা সংস্কারের আন্দোলন দেশব্যাপী দমন-পীড়ন বিরোধী বিক্ষোভে রূপ নেয়। ছাত্রদের আন্দোলনে সমাজের অন্যান্য শ্রেণি পেশার মানুষরাও অংশ নিতে শুরু করে। প্রতিদিন অনেক মানুষ মারা যেতে থাকে তাতে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা দুই শত অতিক্রম করে যায়। আগস্ট নাগাদ সেটা হাজার অতিক্রম করে। মৃতদের বড় অংশ তরুণ-কিশোর-শিশু। আন্দোলন দমনের এক পর্যায়ে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতারও করা হয়। দৈনিক প্রথম আলোর ২৮ জুলাইয়ের বিবরণে গ্রেফতার সংখ্যা ৯ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়। আগস্টের শুরুতে এই সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

ইতোমধ্যে সরকারের আবেদনে উচ্চআদালত থেকে কোটার বিষয়টা সংশোধন করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকুরিতে ৯৩ শতাংশ পদ মেধার ভিত্তিতে পূরণের সিদ্ধান্ত সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর মাঝেই এই আন্দোলন সরকারের পদত্যাগের দাবিতে 'এক দফা'র আন্দোলনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ৫ আগস্ট সেই দাবি পূরণও হয়।

উল্লেখ্য, কোটা আন্দোলন চলাকালেই সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী সংস্থা পিএসসিতে প্রশ্ন ফাঁসের এক চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়। তাতে করে সরকারি চাকুরি প্রত্যাশী শিক্ষিতদের মাঝে হতাশা আরও বেড়েছিল এবং কোটা সংস্কারের দাবি বাড়তি গতি পেয়েছিল। অর্থাৎ কর্মসংস্থানকেন্দ্রীক একটা আন্দোলনই মূলত আগস্টের গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল।

জুলাই-আগস্টে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এই আন্দোলনের খবর বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এই আন্দোলনের সমর্থনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ করেছে। প্রবাসী এই বাংলাদেশীদের বড় অংশই ছিলেন বিভিন্ন দেশে থাকা কর্মজীবী মানুষ। আন্দোলনে সহিংসতার ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দও বিবৃতি দিয়েছেন। আন্দোলন

সফল হওয়ার পর তাঁরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে, দেশ-বিদেশের বাংলাদেশী শ্রমজীবীরা আশা করছিল গণতন্ত্রের সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিকতায় তাদের জীবনমান ও পেশাগত অধিকারেরও উন্নয়ন ঘটবে।

কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনকালে সহিংসতা শুরুর প্রথম দুই দিনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৈনিকের প্রধান সংবাদ শিরোনাম

[এই দুই দিনের মধ্যে প্রথম দিন মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরতদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। আর দ্বিতীয় দিন (বিগত রাতসহ) মূলত আন্দোলনকারীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করার প্রক্রিয়া চলে। শিরোনামগুলো সে আলোকে বিবেচ্য। মূলত তখনকার সহিংস পরিস্থিতির শুরুটা বোঝার লক্ষ্যে এখানে শিরোনামগুলো দেয়া হলো।

১৬ ও ১৭ জুলাই, ২০২৪

সমকাল	: ঢাবিতে ছাত্রলীগের হামলা, হামলা সংঘর্ষে নিভল ৬ প্রাণ
নয়াদিগন্ত	: ঢাবিতে তান্ডব ছাত্রলীগের উত্তাল দেশ, নিহত ৬
সংবাদ	: বিভিন্ন স্থানে কোটাবিরোধী ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে, ৬ জন নিহত
ইনকিলাব	: রক্তাক্ত ঢাবি ক্যাম্পাস সারাদেশ থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন
ইত্তেফাক	: আন্দোলনকারীদের উপর ছাত্রলীগের হামলায় রণক্ষেত্র ঢাবি দিনভর সংঘর্ষ, নিহত ৬
কালেরকণ্ঠ	: দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তিন জেলায় ৬ জন নিহত
নিউএজ	: 350 injured as BCL attacks quota protesters Six killed as clashes erupt all over
ডেইলি স্টার	: BCL unleashes fury on quota protesters 6 Killed as violence spreads
প্রথম আলো	: দফায় দফায় হামলা, সংঘর্ষ, গুলি সারা দেশে বিক্ষোভ-সংঘাত, নিহত ৬
বণিকবার্তা	: কোটা আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, আহত তিন শতাধিক উত্তপ্ত বাংলাদেশ, নিহত ছয়

উপরোক্ত দুই দিনের পরই কোটা সংস্কারের আন্দোলন ক্যাম্পাসগুলো থেকে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে ২৩ জুলাই এ সংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির পর বিক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়। তবে এর মাঝে কারফিউ জারি হয়, রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয় এবং ব্যাপক ধরপাকড় অব্যাহত থাকে এবং এক পর্যায়ে এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়ে গণঅভ্যুত্থানের আকার নেয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে দমাতে যেয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বহু বছর পর আবার কারফিউ জারির ঘটনা ঘটে। কারফিউকালে বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ঘটনা ঘটে। কারফিউ জারির শুরু ১৯ জুলাই শুক্রবার মধ্যরাত থেকে। প্রথমে দিনে-রাতে মিলে দীর্ঘ সময় কারফিউ দিয়ে রাখা হয়। পরে ধীরে ধীরে দিনের বেলায় কারফিউর সময় শিথিল করা হয়। একইভাবে অফিস-আদালতও কয়েকদিন বন্ধ রাখার পর ধীরে ধীরে সীমিত সময়ের জন্য চালু করা হতে থাকে। কিন্তু আগস্টের শুরুতে আবার কারফিউ ও ইন্টারনেট বন্ধের ধারা শুরু হয়। এই অবস্থার অবসান ঘটে ৫ আগস্ট দুপুরে যেয়ে।

সরকারি প্রজ্ঞাপনের পূর্বাপর

কোটা ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনের এক পর্যায়ে উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সমতার নীতি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রতিনিধিত্ব লাভ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, অর্থাৎ সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল গ্রেডে নিম্নরূপভাবে কোটা নির্ধারণ করা হল:

মেধাভিত্তিক ৯৩ শতাংশ
মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ
শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য ১ শতাংশ

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে শূন্য পদ সাধারণ মেধা তালিকা থেকে পূরণ হবে। নতুন প্রজ্ঞাপনের পর কোটা নিয়ে এর আগে জারি করা সকল প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ, অনুশাসন বাতিল করা হয়।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়েছে প্রজ্ঞাপনে। অর্থাৎ এখন থেকে সকল গ্রেডের সরকারি নিয়োগে উপরোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে আন্দোলনের মুখে ২০১৮ সালে কোটা পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া পরিপত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা তুলে দিয়েছিল সরকার। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির (১৩তম থেকে ২০তম গ্রেড) গ্রেডে ৫৬ শতাংশ পদে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগ ছিল।

কিন্তু এক রিট মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০২৪ সালের জুন মাসে ২০১৮ সালের পরিপত্র বাতিল করে কোটা ফিরিয়ে আনার রায় দেয়। তারই প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা আন্দোলনে নেমে শত শত জীবন দিল ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত পোশাক শ্রমিকদের তালিকা প্রকাশ ও পুনর্বাসনের দাবি

দেশব্যাপী জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানকালে শতাধিক শ্রমজীবী মানুষ নিহত হয়েছেন বলে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তে দেখা গেছে। যেমন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বিলস্ জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও পরবর্তী ছাত্রনেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের কালে অন্তত ১১২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বিলস্ বলেছে, তারা ১৬ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছে তাতে আরও দেখা যায় নিহতদের মধ্যে ২৩ শিশু শ্রমিক ছিল, যাদের বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। মৃতদের মধ্যে ২১ জন দোকানদার, ১৫ জন রিকশাচালক, ১২ জন পরিবহনকর্মী, ৯ জন পোশাক শ্রমিক, ৯ জন দিনমজুর, ৬ জন নির্মাণশ্রমিক, ৫ জন হকার, ৪ জন হোটেলকর্মী এবং বাকিরা বিদ্যুৎ ও ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন খাতে কাজ করতেন। বিলস্-এর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় মৃতদের বাইরে অন্তত ২৫ জন শ্রমিকও আহতও হয়েছেন। এছাড়া দুই শিশুসহ মোট পাঁচজন শ্রমিককে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর মাঝে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি ১২ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে ২৬ পোশাককর্মী নিহতের বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে। তাদের প্রকাশিত তথ্যে উল্লিখিত কর্মীদের মধ্যে ঢাকার আশুলিয়ার ছিলেন ৬ জন, গাজীপুরের ৬ জন এবং নারায়ণগঞ্জের ১৪ জন।

রাজধানীর হাতিরপুলে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'পোশাক খাতের চলমান পরিস্থিতি ও করণীয় এবং গণঅভ্যুত্থানে নিহত পোশাক শ্রমিকদের তালিকা প্রকাশ' শিরোনামে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের প্রধান তাসলিমা আখতার। সংবাদ সম্মেলনে নিহতদের যে তালিকা দেয়া হয় তাতে আশুলিয়ার নিহত ৬ জন হচ্ছেন: তৌহিদুর রহমান, শাকিনুর রহমান, শুভ শীল, নাজমুল, নাঈম ও সুমন ইসলাম। গাজীপুরের ৬ জন হচ্ছেন, রহমত, আবদুল আজিজ, আয়াতুল্লাহ, শরিফুল ইসলাম, সোহাগ মিয়া ও আব্দুল্লাহ আল মামুন। নারায়ণগঞ্জের ১৪ জন হচ্ছেন, মো. রাসেল, মিনারুল ইসলাম, ইয়াসমিন চৌধুরী, সোহেল রানা, শাহ আলম, জামান মিয়া, আসিফুর রহমান, সজিব, মিনহাজুল ইসলাম, রাশিদুল ইসলাম, পারভেজ মিয়া, রবিউল, কবির, শামীম শাহদাত ও ফজলুল।

সংবাদ সম্মেলনে আশুলিয়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ শান্তা গার্মেন্টসের কর্মী সুমন ইসলামের বোন মনিকা বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে আর কোনো শ্রমিকের বুকে যেন গুলি না লাগে। সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক শহীদদের সম্মানে অনতিবিলম্বে পোশাক শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ন্যায্য দাবি পূরণ, মজুরি মূল্যায়নসহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয়।

এদিকে, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ১৫ সেপ্টেম্বর

এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রায় ২০০ জন পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন। তবে এই সংগঠন এই দাবির পক্ষে বিস্তারিত কোন তথ্য-উপাত্ত দেয়নি। তবে শ্রমিক হত্যার বিচার, দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করা, হতাহতদের ক্ষতিপূরণ দেয়া ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। একই সঙ্গে এই সংগঠন দাবি করেছে অবিলম্বে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের ৮ সদস্যসহ সব শ্রমিক হত্যার বিচার, দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং আহত শ্রমিকদের উচ্চতর চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া পোশাকখাতে গত মজুরির আন্দোলনকালে শ্রমিকের নামে দায়ের করা ৪৩ মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সব কারখানায় সাত কর্মদিবসের মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধেরও দাবি ছিল তাদের।

উল্লেখ, গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন দেশ গড়ার আলোচনায় শ্রমিকদের আত্মাহুতির বিষয়গুলো কমই আলোচিত হচ্ছিলো। সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১১ অক্টোবর বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি'র সভাপতি তাসলিমা আক্তার ডেইলী স্টার বাংলায় এক লেখায় লিখেছেন, কাজ বা জান হারানোর ভয় কিংবা হয়রানির দমবন্ধ পরিবেশে আটকা পোশাক শ্রমিকের জীবনেও যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান বিরাট সাহস হয়ে প্রভাব ফেলেছে, সেটা অনেকেরই অজানা। ইতিহাস সবসময় ক্ষমতাশীলরা নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং বরাবরই শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের লড়াইয়ের ইতিহাস আরও বেশি চাপা পড়ছে। আমরা চাই ইতিহাস একপাক্ষিক না হয়ে অর্থনীতির চালিকাশক্তি শ্রমজীবীর লড়াই ও আত্মত্যাগ যুক্ত হোক। শ্রমজীবীদের স্বর জাতীয় নীতি পর্যায়েও উচ্চারিত হোক। গুলিবিদ্ধ একেকজন শ্রমিকের গল্প তীব্রভাবে সাক্ষ্য দেয় ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের প্রবল স্রোত কীভাবে শ্রমিকের কারখানায় চার দেয়ালেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। জানান দেয়, কীভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লড়াই পাড়া-মহল্লায় শ্রমিকদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করেছিল।

সেই অভূতপূর্ব সাহস ও হাজারো ছাত্র-শ্রমিক-জনতার প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া নতুন বাংলাদেশে এখন পোশাক শ্রমিকরাও নতুন করে ভয়হীন মুক্ত কর্ম পরিবেশে মর্যাদার জীবনের স্বপ্ন দেখছে। যার নজির সাম্প্রতিক কারখানাভিত্তিক শ্রমিকদের আশু দাবি ও দীর্ঘ মেয়াদের দাবির আন্দোলনের মধ্য থেকে বোঝা যায়। যদিও শ্রমিকদের আন্দোলনে গণঅভ্যুত্থানের অর্জন নস্যাতকারীদের নানা তৎপরতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাসজুড়ে। শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধতাই সব অপচেষ্টা রুখে দেবে– সেই ভরসা আমরা রাখি।

এক বছরে সারাদেশে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৭৫৮ জন শ্রমিক

কর্মক্ষেত্রে বিগত ১ বছরে (১ জানুয়ারী - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪) সারাদেশে ৬৩৯ টি দুর্ঘটনায় ৭৫৮ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। ২০২৩ সালে একই সময়ে সারাদেশে ৭৭২ টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৮৭৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছিল। গত বছর থেকে এবছর কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমেছে । কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়ার পথে যে সকল শ্রমিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তাদেরকেও এই জরিপে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত (১৫টি জাতীয় এবং ১১টি স্থানীয়) খবরের ওপর ভিত্তি করে বেসরকারি সংস্থা সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)পরিচালিত একটা জরিপ থেকে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় এসআরএস সম্মেলন কক্ষে নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের জরিপ প্রতিবেদন ২০২৪ উপস্থাপন করেন।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছেন পরিবহন খাতে। যাঁদের সংখ্যা মোট ৩৭৯ জন। এর পরেই রয়েছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান (যেমন- ওয়ার্কশপ, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ১২৯ জন, নির্মাণ খাতে নিহত হয়েছে ৯২ জন, কল-কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে এই সংখ্যা ৭০ জন এবং কৃষি খাতে ৮৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে।

মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৬৪ জন; বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৮১ জন; আগুন এবং বিভিন্ন বিস্ফোরণে ৩০ জন; মাঁচা বা উপর থেকে পড়ে মারা গেছেন ৫০ জন; বজ্রপাতে ৬৯ জন; শক্ত বা ভারী কোন বস্তুর দ্বারা আঘাত বা তার নিচে চাপা পড়ে ২১ জন; পাহাড় বা মাটি, ব্রিজ, ভবন বা ছাদ, দেয়াল ধ্বসে ৭ জন; রাসায়নিক দ্রব্য বা সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পানির ট্যাঙ্কের বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ১১ জন; পানিতে ডুবে ১৭ জন এবং অন্যান্য কারণে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলা বসন্তে ২৬ জন রিকশাচালকও জীবন দিয়েছেন

২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত শহীদদের মাঝে ২৬ জন পাওয়া গেছে যাঁরা সরাসরি রিকশা শ্রমিক ছিলেন। ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়া মেহনতি মানুষদের এই রাজনৈতিক আত্মাহুতির ঘটনা এদেশের শ্রমজীবীদের ইতিহাসের এক অনন্য বিরল ঘটনা বলে মনে করছেন অনেকেই।

শহীদদের তালিকা যাচাই বাছাই করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রফিক আমিন রিকশাচালকদের এই তালিকাটি তৈরি করেছেন। পরে তা 'জুলাই ম্যাসাকার আর্কাইভ'-এ তুলে ধরা হয়।

এটা খুব বিস্ময়কর যে, ঢাকা ও দেশের অন্যত্রও রিকশাচালকরা রাজনৈতিক বর্গ হিসেবে রাজনীতিবিদদের খুব মনযোগ পাননি কখনো। এই মানুষরা সমাজের উন্নয়ন আলোচনায় বরাবরই অনুপস্থিত। মানুষ বহন করে নিয়ে চলা, জীর্নশীর্ণ, অপুষ্ট মানুষগুলোর দিকে সমাজ ভালো করে ফিরেও তাকায় না। দশটা রিকশা একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে অনেক সময়ই শনাক্ত করতে কষ্ট হয় কে তাঁরা আলাদা। এরকম অবহেলিত মানুষগুলোও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিতে অকাতরে জীবন দিয়েছেন।

রফিক আমিনের তালিকা অনুযায়ী আলোচ্য রিকশাচালকরা হলেন: সাগর, ইমন, আবু সুফিয়ান, হাফিজুর ইসলাম, কমর উদ্দিন, আবু সুফিয়ান-২, আসাদুল হক বাবুল, কামাল মিয়া, নুরু বেপারি, রমজান, মাসুদুর রহমান জনি, সুমন হাসান, বিপ্লব হোসেন, ইমন গাজী, মাসুম মোল্লা, জাহাঙ্গীর হাওলাদার, বাবু মোল্যা, কামাল মিয়া, রনি প্রামাণিক, মনিরুজ্জামান মনির, মো. তুহিন, বকুল মিয়া, মনজু মিয়া, রিপন, আখতার হোসেন এবং অজ্ঞাতপরিচয় একজন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অতীত রাজনৈতিক ইতিহাসে মেহনতি মানুষদের অবদান সামান্যই সংরক্ষিত থেকেছে। যদিও মুক্তিযুদ্ধসহ সকল বড় আন্দোলনে তাঁরা ছাত্র-জনতার অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে থেকেছেন। এবারও তিন চাকার মানুষদের ২ আগস্টের দ্রোহ যাত্রায় ব্যারিকেড হয়ে সংহতি জানাতে দেখা গিয়েছিল।

এসময় আগে-পরে রিকশাওয়ালারা মাস্তান-গুন্ডা এবং পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আন্দোলনের কর্মীদের নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছেন অনেক জায়গায়। আধাপেটা খেয়েও অনেক সময় ভাড়া ছাড়াই তারা আহতদের বহন করেছেন।

উপরোক্ত শহীদদের কে কোথায় জীবন দিয়েছেন সেসব কাহিনীও ইতোমধ্যে সংবাদকর্মীরা যোগাড় করতে শুরু করেছেন। যেমন, দেশ রূপান্তর পত্রিকায় গত ৫ নভেম্বর আমজাদ হোসেন হৃদয় লিখেছেন রিকশাচালক বকুল মিয়ার কথা। সেখানে দেখা যায়, আগের জীবনে কৃষিকাজ করে ছেলেমেয়ের পড়ালেখার খরচ আর সংসার চালাতেন বকুল মিয়া। গত ঈদুল আজহার পর থেকে কাজ কম থাকায় ধারদেনা করতে হয়েছে তাঁকে। বেড়ে যায় ঋণের টাকা। এই ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য গত ১২ জুলাই বকুল মিয়া আসেন ঢাকায়। থাকতেন দক্ষিণখান এলাকায়। গ্যারেজ থেকে রিকশা ভাড়া নিয়ে চালাতেন। প্রতিদিন মোবাইল ফোনে কথা বলতেন স্ত্রী মনিকা বেগমের সঙ্গে। তার সঙ্গে সর্বশেষ কথা হয় গত ১৮ জুলাই সকালে। স্ত্রীকে বলেছিলেন, কয়েক দিন পর বাড়ি যাবেন। বকুল মিয়া ঠিকই বাড়ি ফিরেছেন, তবে লাশ হয়ে। গত ১৮ জুলাই ঢাকার উত্তরার আজমপুর রেলগেটে কোটা সংস্কার আন্দোলনের বিক্ষোভ চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তিনি। এতে চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাঁর দুই শিশুসন্তান মাহাদী হাসান শুভ ও বুসরাত জান্নাত মিতুসহ স্ত্রীর ভবিষ্যৎ। স্বামী হারিয়ে দিশেহারা বকুল মিয়ার স্ত্রী মনিকা বেগম।

শহীদ হওয়া বকুল মিয়া শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার চাউলিয়া গ্রামের শামছুল হকের ছেলে। স্ত্রী মনিকা বেগম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'মোবাইল ফোনে খবর পাই। পরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঢাকার হাসপাতাল থেকে স্বামীর লাশ বাড়িতে নিয়ে আসি।'

আরেকজন শহীদ রিকশাচালক মনজু মিয়ার কাহিনীও তুলে ধরেছে দেশ রূপান্তর। সেখানে দেখা যায়: মনজু মিয়া (৪০) রংপুরের পীরগাছার ছাওলা ইউনিয়নের জুয়ানের চর গ্রামের এনছের আলীর ছেলে। পরিবার নিয়ে বড়বাড়ী জয়বাংলা রোড এলাকার একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন। ভূমিহীন মনজু মিয়া সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা আনতে দুই বছর আগে স্ত্রী রাহিমা বেগমকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তিনি রিকশা চালাতেন, আর স্ত্রী একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। তাদের চার বছরের মেয়ে ও দুই বছর বয়সী ছেলে তাম্বুলপুর ইউনিয়নের রহমতচর গ্রামে নানার বাড়িতে থাকতেন। স্বামীকে হারিয়ে শোকে কাতর রাহিমা বেগম বলেন, 'পুলিশ আমার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমাদের বেঁচে থাকার স্বপ্নটুকু কেড়ে নিয়েছে। বাচ্চা দুটোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কত আশা নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিলাম। এখন তো আমার আর কিছুই থাকল না। কে দেখবে আমার অবুঝ বাচ্চাদের? কার কাছে বিচার চাইব? আমরা তো গরিব মানুষ, আল্লাহর কাছে বিচার চাইছি।'

শ্রমিক রনির কাহিনীও একইভাবে বেদনাদায়ক। আন্দোলনের কারণে সরকার কারফিউ জারি করায় দুদিন রিকশা চালাতে পারেননি রনি প্রামাণিক। রোজগার বন্ধ থাকায় ঘরে ছিল না চাল-ডাল। সন্তানের জন্য ওষুধ কেনাও দরকার ছিল। এজন্য বাধ্য হয়ে ২০ জুলাই সকাল ৯টার দিকে গ্যারেজ মহাজনের কাছ থেকে রিকশা নিয়ে বের হন। বেলা ১১টার দিকে সাভার বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলেন যাত্রীর জন্য। এরই মধ্যে হঠাৎ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি ছোড়ে পুলিশ, যা লাগে রিকশাচালক রনির শরীরে। খবর পেয়ে শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে স্বামীর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্ত্রী সাথী বেগম। দেখেন তার বুকে-পিঠে অসংখ্য গুলির চিহ্ন।

নিহত রিকশাচালকদের তালিকা সংগ্রহ করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রফিক আমিন বলেন, 'ইতিহাসের শ্রেণি চরিত্র আছে। শ্রমিক-কৃষক, নিম্নবর্গের মানুষকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয় অথবা আড়াল করা হয়। কিন্তু তারাই মূলত লড়াই করে ইতিহাস নির্মাণ করে। ১৫ জুলাই ঢাকা শহরে রিকশা শ্রমিকদের মিছিলে শ্লোগান ছিল: 'ছাত্র ভাই ভয় নাই রাজপথ ছাড়ি নাই।'

২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ রিকশা চালকদের তালিকা

১	শহীদ সাগর
২	শহীদ ইমন
৩	শহীদ আবু সুফিয়ান
৪	শহীদ হাফিজুর ইসলাম
৫	শহীদ কমর উদ্দিন
৬	শহীদ আবু সুফিয়ান
৭	শহীদ আসাদুল হক বাবুল
৮	শহীদ কামাল মিয়া
৯	শহীদ নুরু বেপারি
১০	শহীদ রমজান
১১	শহীদ মাসুদুর রহমান জনি
১২	শহীদ সুমন হাসান
১৩	শহীদ বিপ্লব হোসেন
১৪	শহীদ ইমন গাজী
১৫	শহীদ মাসুম মোল্লা
১৬	শহীদ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
১৭	শহীদ বাবু মোল্যা
১৮	শহীদ কামাল মিয়া
১৯	শহীদ রনি প্রামাণিক
২০	শহীদ মনিরুজ্জামান মনির
২১	শহীদ মো: তুহিন
২২	অজ্ঞাত শহীদ রিকশাচালক (৩০), কাজলা যাত্রাবাড়ী
২৩	শহীদ বকুল মিয়া
২৪	শহীদ মনজু মিয়া
২৫	শহীদ রিপন
২৬	শহীদ আখতার হোসেন

প্রতিরোধ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সংযোজন ও বিয়োজন চলমান। তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন।

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান

এক তরুণের জীবন বাঁচাতে একজন রিকশা শ্রমিকের প্রচেষ্টা যেভাবে নজর কাড়লো

ঘটনাটি গণঅভ্যুত্থানের আগের দিন ৪ আগস্ট ২০২৪ এর। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলন ততদিনে রূপ নিয়েছে সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনে। নয় দফার আন্দোলন চলে এসেছে এক দফায়। সরকার সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছে। অনির্দিষ্টকালের কারফিউ চলছে। কারফিউ ভেঙে রাস্তায় নেমে আসছে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। ঢাকায় চারপাশে কাঁদানে গ্যাসের শেলের ঝাঁজ। সাউন্ড গ্রেনেড আর গুলিতে প্রকম্পিত বিভিন্ন এলাকা।

রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রের একটি এলাকা ফার্মগেট। ফার্মগেটের কালো পিচের রাস্তায় একটি রিকশা। রিকশার সিটে বসা চালক। পাদানিতে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে এক তরুণ। পরনে নীল টি-শার্ট। আকাশের দিকে মুখ। চোখ বন্ধ। কপালে বাঁধা স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার ফিতা। হয়তো তরুণটি গুলিবিদ্ধ। হয়তো তরুণটি বেঁচে আছে। এই ভেবে রিকশা চালক প্রাণপণ চেষ্টা করছেন কোনভাবে কোথাও এই তরুণকে চিকিৎসকদের কাছে নিতে। কিন্তু কোথায় পাবেন সেটা? চারিদিকে রয়েছে পুলিশও।

৫ আগস্ট এই দৃশ্যপটের ছবি ছাপা হয়েছে ঢাকার দু-তিনটি পত্রিকায়। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ছাপা হওয়া ছবিটি তুলেছেন আলোকচিত্র সাংবাদিক জীবন আহমেদ। জীবনের তোলা ছবিটি ছিল একটা ক্লোজ শট। ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে ছাপা হওয়া ছবিটা একই ধরনের তবে এতটা ক্লোজ নয়। একটু দূরের শট।

বণিক বার্তায় ছাপা হওয়া কাজী সালাউদ্দিন রাজুর তোলা ছবিটি আরেকটু বড় ফ্রেমের। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে গুলিবিদ্ধ তরুণকে বহন করা রিকশাটি হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন চালক। চালকের আশপাশে দেখা যাচ্ছে বেশকিছু পুলিশ। ওয়াকিটকি হাতে পুলিশ অফিসারটি হাতের আঙুল উঁচিয়ে সোজা একটি দিক দেখাচ্ছেন। অন্য পুলিশগুলো অফিসারটির দিকনির্দেশিত আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবি দেখে যা বোঝা যাচ্ছে, হয়তো তিনি ধমক দিচ্ছিলেন চালককে।

পরবর্তীকালে ১২ আগস্ট ২০২৪, প্রথম আলোয় প্রকাশিত মানসুরা হোসাইনের এক প্রতিবেদন থেকে সবাই জানতে পারে, গুলিবিদ্ধ তরুণের নাম গোলাম নাফিজ। সে রাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়ে পাস করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। পরিবারসহ থাকত মহাখালীতে। দুই ভাই তারা। নাফিজ ছোট। আন্দোলন করতে গিয়ে ৪ আগস্ট বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ফার্মগেটের ওভারব্রিজের নিচে নাফিজ গুলিবিদ্ধ হয়।

রিকশা চালক নূর মোহাম্মদ গুলিবিদ্ধ নাফিজকে নিয়ে রাজধানীর ফার্মগেটের একটি হাসপাতালে ঢুকতে গেলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা বাধা দেন বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক। পরে ১৭ বছরের গোলাম নাফিজকে নিয়ে রিকশাচালক খামারবাড়ির দিকে চলে যান। স্পটে উপস্থিত দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদ ও বণিক বার্তা পত্রিকার কাজী সালাউদ্দিন রাজু পুলিশ

ও আওয়ামী লীগ নেতাদের বাধার পরও রিকশার পাদানিতে ঝুলতে থাকা নাফিজের কয়েকটি ছবি তুলতে পেরেছিলেন।

মানবজমিন পত্রিকাটির প্রথম পাতায় ছাপা হওয়া নাফিজের ছবি ওই রাতেই ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছবি দেখেই নাফিজের মা-বাবা সন্তানের খোঁজ পান। নাফিজের লাশ তারা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে নিয়ে আসেন। এরপর সবাই সঙ্গতকারণেই নাফিজের কথাই বলছিল। কিন্তু রিকশা চালক নূর মোহাম্মদও যে এই অভ্যুত্থানের ঐ ভীতিভরা সময়ে অনন্য এক দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছিলেন সেটা খুব কমই বলাবলি হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোকচিত্রি জীবন আহমেদের তোলা সেই ছবিতে রিকশার পেছনে একটি মুঠোফোন নম্বর দেখা গেছে। ওই নম্বরে ফোন দিয়ে রিকশাচালক নূর মোহাম্মদকে খুঁজে বের করেন নাফিজের পরিবারের সদস্যরা।

রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ জানিয়েছেন, রিকশা তাঁর নিজের। ওই দিন ফার্মগেটে 'গ্যাঞ্জামের' মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন তিনিও। গোলাগুলি হচ্ছিলো বৃষ্টির মতো। তিনি যাচ্ছিলেন মগবাজারের দিকে। এসময়ই গোলাগুলিতে নাফিজ আহত হয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় 'একটা লোক যদি নাফিজকে নিয়ে বইতো তাও জোরে চালিয়ে নিতে পারতাম।' কিন্তু পুলিশের ভয়ে সেটা সম্ভব ছিল না। আশেপাশে শুধু পুলিশ। পুলিশ তখন নূর মোহাম্মদকে বলে, লাশ ফালাইছি, এটা তুলে নিয়ে যা। নূর মোহাম্মদ বলছিলেন, 'আমাকে তিন চারবার গালাগালিও করছে পুলিশ এসময়। আমি তখন লোকটার পিঠের দিক ধরলাম। পুলিশ পায়ের দিক ধরে রিকশায় ফিক্কা মারলো।'

এসময় নাফিজকে নিয়ে নূর মোহাম্মদ প্রথমে ফার্মগেটের একটি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েও পারেননি। পরে খামারবাড়িতে গেলে কয়েকজন নাফিজকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে বলে একটি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে চলে যান। তিনিও দিয়ে দেন– এই আশায় যে লোকটা হয়তো বাঁচবে। কিন্তু নাফিজ বাঁচেনি।

তার বাবার পরের অধ্যায়ের বিবরণ ছিল এরকম: ওই দিন রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ছেলেকে খুঁজতে বের হয়েছিলেন তিনি। কয়েকবার পুলিশি বাধার মুখেও পড়েন। ফার্মগেট আর সোনারগাঁও মোড়ে কয়েকবার ঘুরে আসেন। বিভিন্ন থানায় খোঁজ নেন। ভেবেছিলেন, ছেলেকে হয়তো আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। না পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েও খুঁজতে যান। গোলাম রহমান বলেন, 'কোথাও না পেয়ে রাত ১২টা নাগাদ বাসায় ফিরি। এরপরই বড় ছেলে মানবজমিনে ছাপা হওয়া ছবিটা দেখায়। বুঝতে পারি, ছেলেটা হয়তো ততক্ষণে আর বেঁচে নাই। বিভিন্ন হাসপাতালে ছেলেকে খুঁজতে শুরু করি।'

গোলাম রহমান বলেন, 'ঢাকা মেডিকেলের মর্গে ২৭টি লাশ। আমরা তো লাশ দেইখ্যা অভ্যস্ত না। তারপরও দেখি যদি ছেলেরে পাই। মানবজমিনের ছবিটা দেখার পর বুঝতে পারি ছেলে মারা গেছে। তবে যে করেই হোক ছেলের লাশটা পাইতে হবে। মন তো মানে না।'

ঘড়ির কাঁটা ততক্ষণে দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার ঘরে। নাফিসের মামা আবুল হাসেম ফোন করে গোলাম রহমানকে জানান, নাফিজের লাশ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। লাশ আনার পর নিজেই ছেলেকে গোসল করান বাবা। বললেন, 'ছেলের লাশ নিজেই গোসল করালাম। কী যে কষ্ট।'

(প্রতিবেদনটি বণিকবার্তার মোজাব্বীর হাসান ও প্রথম আলোর মানসুরা হোসাইনের লেখায় ব্যবহৃত তথ্য সহায়তায় তৈরি। ডেইলি স্টারে প্রকাশিত নূর মোহাম্মদের সাক্ষাৎকার থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে।)

অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ৩০ সেপ্টেম্বর

শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি'র বিবৃতি

গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে ঢাকার নিকটবর্তী আশুলিয়া অঞ্চলে শ্রমিকরা পেশাগত নানান দাবিতে আন্দোলন করছিল। সেই আন্দোলনে এক পর্যায়ে এই শিল্পাঞ্চলের টঙ্গাবাড়ী এলাকায় ৩০ সেপ্টেম্বর যৌথবাহিনীর গুলিতে শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে ২ অক্টোবর গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির পক্ষে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ প্রচার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিবৃতি পাঠান।

বিবৃতিতে বলা হয়, আশুলিয়ায় যৌথবাহিনীর সদস্যদের গুলিতে শ্রমিক কাউসার খান নিহত হয়েছেন এবং আরও চার শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এছাড়া অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন।

আমরা দেখেছি ২০২৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকরা ২৫ হাজার টাকা ন্যুনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং এর ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছিল তখনকার ফ্যাসিবাদের খড়্গ। সেসময় চারজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছিল। পরে মামলা, ছাটাই, নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে জোর করে ১২ হাজার ৫০০ টাকা মজুরিতে কারখানায় পাঠায় শ্রমিকদের।

জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংগ্রামের উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, আন্দোলনে আশুলিয়ায় অনেক গার্মেন্টস শ্রমিক শহীদ হন। তাঁরা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাই পরিবারগুলো এখন স্বাভাবিকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বন্ধ কল-কারখানা খুলে দেওয়া, বকেয়া ও মজুরির দাবি আদায়ে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে 'বহিরাগতের উসকানি', 'প্রতিবিপ্লবী' ট্যাগ লাগিয়ে নস্যাৎ করতে চাওয়া হচ্ছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কয়েকদিন পরপর একাধিক কারখানায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া, শ্রমিকের বকেয়া এবং সার্ভিস বেনিফিটের টাকা আটক রাখা, শ্রমিক ছাঁটাই এবং লে-অফের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর বার্ডস গ্রুপের শ্রমিকদের নির্ধারিত পাওনা পরিশোধের কথা ছিল। তারিখ পিছিয়ে আরও তিন মাস সময় চায় কর্তৃপক্ষ। অগ্রহণযোগ্য এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য তথাকথিত কিছু শ্রমিক নেতার সঙ্গে ১২ লাখ টাকার বিনিময়ে দফারফা হয় এবং শ্রমিকের আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করার অপচেষ্টা চালানো হয়। এতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সড়ক অবরোধ করে।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি আরও জানায়, একই দিনে সার্ভিস বেনিফিট ও ক্ষতিপূরণসহ বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে প্রায় ৫ ঘণ্টা আশুলিয়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ডংলিয়ন গ্রুপের শ্রমিকরা। পাশাপাশি মন্ডল গ্রুপের শ্রমিকদের প্রতিনিধির সঙ্গে মালিকপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ত্রিপক্ষীয় বৈঠক চলাকালে শ্রমিকরা রাজপথে অবস্থান নেয়। এ সময় দায়িত্বরত যৌথ বাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে সেখানে লাঠিচার্জ শুরু হয়। পরে শ্রমিকদের বিক্ষোভে গুলি ছুঁড়লে একজন শ্রমিক নিহত হন। অর্থাৎ শ্রমিকের বাস্তবসম্মত দাবিগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে তাদের আন্দোলনকে দমন করতে নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। শ্রম মন্ত্রণালয় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে দফায় দফায় মিটিং করছে এবং কিছু চুক্তিনামাও প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে আন্দোলনরত শ্রমিকদের দায়দায়িত্ব সরকার নিচ্ছে না।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি এই শ্রমিক হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং শ্রমিক হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচারের দাবি করে। পাশাপাশি সরকারকে অতি দ্রুত বন্ধ কারখানা খুলে দিয়ে, শ্রমিকদের বকেয়া, সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধসহ সব দাবি-দাওয়া মেনে শিল্পাঞ্চলকে শান্ত করার দাবি জানাই। শ্রমিকদের ওপর আর যেন একটি গুলিও না চলে সে বিষয়ে সরকারকে অবশ্যই শক্ত অবস্থান নিতে হবে।

ডেইলি স্টার অনলাইন বাংলা থেকে সংকলিত, ২ অক্টোবর ২০২৪

শ্রম আইন সংশোধনে আন্তর্জাতিক পরিসরে অঙ্গীকার করলো বাংলাদেশ

২০২৪ এর ২৮ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পরিচালনা পর্ষদের ৩৫২তম অধিবেশনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে আগামী বছরের মার্চের মধ্যে দেশে শ্রম আইন সংশোধন করা হবে। এছাড়া আইএলও গভর্নিং বডির বৈঠকে সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বায়োমেট্রিক হাজিরার ভিত্তিতে শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্তকরণ পর্যালোচনা এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের লাঞ্ছনা ও হয়রানি বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শ্রম আইন সংশোধন বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত বিষয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), আইএলও, বিদেশি ব্যবসায়ী ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান, উত্তর আমেরিকার পোশাক ব্যবসায়ী এবং মার্কিন সরকারও বাংলাদেশকে শ্রম আইন সংশোধন, ট্রেড ইউনিয়ন আইন সহজ করা, ইউনিয়ন নিবন্ধন সহজ করাসহ ইউনিয়ন গঠনে প্রয়োজনীয় শ্রমিক সীমা কমানোর আহ্বান জানিয়ে আসছে। এসব কারণেই ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কয়েকটি মূল ধারায় আরও সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে তাতে স্বাক্ষর না করে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল-২০২৩' ফেরত পাঠান।

শ্রমিক সংগঠকদের মতে, বর্তমানে একটি পোশাক কারখানায় ইউনিয়ন গঠনের জন্য ২০ শতাংশ শ্রমিকের ঐকমত্য ও স্বাক্ষর প্রয়োজন। ইউনিয়ন নেতারা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই সীমা পাঁচ থেকে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনার পক্ষে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র চায় এ হার ১০ শতাংশে নামানো হোক। তবে সরকার ১৫ শতাংশের ব্যাপারে রাজি হয়েছে। ভবিষ্যতে এ হার আরও কমতে পারে।

এছাড়া রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ও ইপিজেডের বাইরের শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের জন্য একটি অভিন্ন শ্রম আইন প্রণয়নের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা। এই বাস্তবতাতেই ১০ নভেম্বর প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে: বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে অধ্যাদেশ জারি করবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা, তাঁদের চাকরিকালীন সুবিধা দেওয়া এবং নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করার বিষয়গুলো অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এসব সংশোধনীতে।

গণঅভ্যুত্থানের পর সেপ্টেম্বরে পোশাক খাতের সমস্যা নিরসনে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ১৮ দফা সমঝোতা হয়েছিল। ওই ১৮ দফা সমঝোতার একটি ছিল বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন।

ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন, হাজিরা বোনাসহ টিফিন বিল ও নাইট বিল দেওয়া, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলা প্রত্যাহার, রেশন চালু, ঝুট ব্যবসা বন্ধে কেন্দ্রীয় তদারক ব্যবস্থা, জুলাই বিপ্লবে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা দেওয়া ইত্যাদি ছিল ১৮ দফার বিভিন্ন দাবি।

মজুরি বোর্ড মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা চায়

এদিকে শ্রম আইনের মজুরি সংক্রান্ত দিকের বাস্তবায়ন তদারকিতে মজুরিবোর্ড মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা চেয়েছে গত বছর।

উল্লেখ্য, দেশের সংবিধিবদ্ধ মজুরি নির্ধারণকারী একমাত্র সরকারি সংস্থা নিম্নতম মজুরি বোর্ড। নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। ২০২৪ এর নভেম্বরে তারা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে একটা চিঠি দিয়েছে।

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ স্বাক্ষরিত 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা সংশোধন বা সংযোজন সংক্রান্ত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের প্রস্তাব বা মতামত' সংক্রান্ত চিঠিতে আরও বলা হয় মজুরি ও শ্রম বিষয়ের তদারকিতে বাড়তি ক্ষমতা পাওয়ার লক্ষ্যে নিম্নতম মজুরি বোর্ডকে শক্তিশালীকরা ও শ্রমিকদের মজুরি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালায় কিছু সংযোজন বা সংশোধন দরকার হতে পারে।

উল্লেখ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, শ্রম আইন ২০০৬-এর ভিত্তিতে পাঁচ বছর অন্তর বিভিন্ন খাতের ন্যুনতম মজুরি ঘোষণা করতে পারে সরকার। মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ৪৩টি শিল্প খাতে ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর মধ্যে গত এক দশকে ঘোষণা হয়েছে ২৯টি মজুরি কাঠামো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় এসব মজুরি কাঠামো অনেকটাই ১-২ বছরই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। এ অর্থ দিয়ে বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের পরিবার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়েছেন অনিশ্চয়তায় পড়তে হচ্ছে। উপরন্তু সেই মজুরিও তারা নিয়ম মতো সঠিকভাবে পাচ্ছেন না।

ফলে প্রায়ই বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে। এরকম বাস্তবতাতেই অনেকে শিল্প পরিস্থিতির উন্নয়নে বর্তমান শ্রম আইনের যুগোপযোগী সংস্কারের কথা বলেছেন।

ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা চাওয়ার বিষয়ে দৈনিক বণিকবার্তা ৮ নভেম্বর একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি আইনে নেই। আমরা এটি নতুন করে চাচ্ছি। বোর্ড থেকে আমরা শুধু মজুরির সুপারিশটা মন্ত্রণালয়ে পাঠাই। মজুরি ঘোষণা হওয়ার পর সেটির বাস্তবায়ন তদারক করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। তারা আসলে সম্পূর্ণভাবে বিষয়টি দেখে না। সে কারণে আনরেস্টগুলো হচ্ছে। এগুলোর বেশির ভাগই কিন্তু মজুরি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে হচ্ছে। ১৪৮ ধারায় বলা আছে, মালিক মজুরি দিতে বাধ্য থাকবেন। মজুরি কাঠামোর কম দিতে পারবেন না। তাই আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা চাচ্ছি, যেন কোনো অভিযোগ এলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে গিয়ে দেখতে পারি সেটি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা। আর না হলে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নেব। অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্থায় যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে সেটি আমরা মজুরি বোর্ডেরও চাচ্ছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান

বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে বাস্তব অবস্থা জানতে নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০ সদস্যের একটা প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসে। এই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের ভবিষ্যতের শ্রম আইনে গুরুত্ব দেয়ার জন্য ১১টি বিষয় তুলে ধরে। এর প্রথমটি হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শ্রমিক ও শ্রম অধিকারকর্মীদের যাঁরা নিপীড়ন করে ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায় তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কাজ করে, এমন কারখানার মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনা।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলো যে মানের অধিকার ভোগ করে, সে অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রম আইন ও বিদ্যমান শ্রমবিধি সংশোধন।

আরও যেসব বিষয় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশায়, সেগুলো হচ্ছে: বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোর (ইপিজেড) শ্রমিকেরা যাতে পুরোদমে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) আইনের ৩৪ নম্বর ধারা সংশোধন ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় (এসইজেড) সেটির প্রয়োগ এবং সেখানকার শ্রমিকেরা যাতে সংগঠিত হতে পারেন ও সম্মিলিতভাবে দর-কষাকষিতে সক্ষম হন, তা নিশ্চিত করা; ট্রেড ইউনিয়ন করার আবেদনের প্রক্রিয়া ৫৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা; শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে তার বিদ্যমান অনলাইন নিবন্ধন পোর্টালে অপেক্ষমাণ থাকা সব আবেদনের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ; বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ ও এ জন্য তহবিল বরাদ্দ দেওয়া; শ্রম পরিদর্শকের আরও পদ অনুমোদন এবং নিবন্ধন বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করার অভ্যাস বন্ধ করা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণবিহীন বিপুল বেকার; দ্রুত কয়েক লাখ কর্মসংস্থান কি সম্ভব?

২০২৪ সালের বাংলাদেশ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কর্মসংস্থান বিষয়ক এক আন্দোলনের রাজনৈতিক গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে। তবে বছরের শেষ দিক থেকে প্রচার মাধ্যমগুলোতে কর্মসংস্থান সংকটের সংবাদ আবারও বড় আয়তনে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

সরকারি তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ২০২৪ সালে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৬৫ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে প্রায় ২৮ শতাংশ তরুণ-তরুণী। বিশ্বের কম দেশে জনসংখ্যায় তরুণদের এত আধিক্য দেখা যায় এখন। এর একটা ভালো দিক হলো নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর চেয়ে দেশে তাদের দায়িত্ব নেয়ার মতো কর্মক্ষম মানুষ বেশি। দেশ জনমিতিক সুবিধার মধ্যে রয়েছে।

আবার বিপদের দিক হলো কর্মক্ষমরা আয়ের মতো কাজ না পেলে নির্ভরশীলরাসহ জনসংখ্যার বড় অংশই মুশকিলে পড়তে পারে এবং সেই শঙ্কার কথাই বলছিলেন অনেক অর্থনীতিবিদ। তাঁদের মতে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মে প্রত্যাশীত সুযোগ সৃষ্টি করে এখনকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা না গেলে জনমিতিক সুবিধা বুমেরাং হতে পারে।

২০২৪ এর ১ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোতে নাজনীন আখতার লিখেছেন, দেশে বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুসারে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা যাচ্ছে না। ফলে অনেক তরুণের কোনো কাজ নেই। তারা বেকার হয়ে ঘুরছেন। এই সংখ্যা বাড়ছে। এর মাঝে, ২০২৪ -এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অনুসন্ধানগুলোতে দেখা যাচ্ছে, বিগত দেড় দশকে দেশজুড়ে বহু মেগা প্রকল্প নেয়া হলেও তাতে কর্মসংস্থান সমস্যার বড় কোন সুরাহা হয়নি। অর্থাৎ বেকারত্ব কমাতে মেগা-প্রকল্প-মডেল ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। কেবল তাই নয়– বিগত দশকগুলোতে কথিত বহু চেষ্টার পরও কর্মসংস্থানের উপযোগী খাতভিত্তিক বৈচিত্র্যকরণও ঘটেনি। সরকারি চাকরি, কৃষি, সেবা, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, তৈরি পোশাক, অভিবাসন, নির্মাণখাতের মতো মজুরিভিত্তিক শ্রম ইত্যাদিই রয়ে গেছে কাজ পাওয়ার জায়গা হিসেবে। এর মাঝে শুধু শহরাঞ্চলে গিগকর্মীদের নতুন একটা জগত তৈরি হয়েছে। যদিও আইনগত সুরক্ষার অভাবে সেটাকেও দীর্ঘমেয়াদে কাজের ভরসা হিসেবে নিতে পারছে না তরুণরা। কর্মসংস্থানের খাতভিত্তিক বৈচিত্রকরণ না হওয়ার মাঝে এই একটা দুষ্টচক্রও তৈরি হয়েছে। একদিকে বৈচিত্রকরণের জন্য নতুন শ্রমশক্তির প্রশিক্ষণ নেই। আবার প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে নতুন নতুন খাত গড়েও উঠছে না। নতুন বিনিয়োগকারীও আসছে না।

বিপুল কর্মক্ষম মানুষের প্রযুক্তিগত কোন প্রশিক্ষণ নেই

২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখের বেশি। বেসরকারি অনুমান অবশ্য আরও বেশি। তবে সরকারি হিসাবের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮ কোটি ৫৬ লাখের বেশি এবং পুরুষের সংখ্যা ৮ কোটি ৪১ লাখের বেশি। ২০২৪ এর ৫ জুন, গণঅভ্যুত্থান শুরুর আগের মাসে প্রকাশিত, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩ অনুসারে, দেশে বেকারত্বের হার ৩ শতাংশ। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৫৭ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৪

বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৯ শতাংশ শিক্ষা, চাকরি বা প্রশিক্ষণ কোনোটিতেই নেই। পুরুষদের মধ্যে এ হার ১০ শতাংশ। আর নারীদের মধ্যে এ হার প্রায় ২৭ শতাংশ।

অন্যদিকে, একই বছর ৬ মে প্রকাশিত বিবিএসের প্রথম ত্রৈমাসিকের শ্রম জরিপ অনুসারে, দেশে শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৭ লাখ। এর মধ্যে ২৫ লাখ ৯০ হাজার বেকার। বাকিরা কর্মে নিয়োজিত। বেকারত্বের হার প্রায় ৪ শতাংশ। ২০২৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনেও এ হার একই ছিল। বিবিএসের আগস্টে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, দেশে মোট বেকার ২৬ লাখ ৪০ হাজার। (প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর ২০২৪)।

২০২৪ সালের উপরোক্ত প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুসারে, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী যুব শ্রমশক্তির সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লাখ। এর মাঝে বিবিএসের স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২৩ এর ফলাফল প্রতিবেদন অনুসারে, প্রায় ৪০ শতাংশ তরুণ-তরুণী শিক্ষা-কর্ম বা প্রশিক্ষণ পায়নি। পুরুষদের মধ্যে এ হার প্রায় ১৯ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে এ হার প্রায় ৬১ শতাংশ। এই তথ্য স্পষ্ট জানাচ্ছে, বাংলাদেশে কেবল যে বিপুল বেকারত্ব রয়েছে তাই নয়। এখানকার বেকাররা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সুবিধাও পায়নি। ফলে তারা অনেকটাই অদক্ষ শ্রমজীবীর অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে নারীদের প্রশিক্ষণহীনতা যুবকদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

বলা বাহুল্য, নারী-পুরুষ মিলে এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়ে আসতে না পারলে দেশ কেবল তরুণরাই নয়, তাদের উপর নির্ভরশীলরাও বিপদে পড়বে, তথা– জনমিতিক লভ্যাংশ পাওয়ার যে সুবিধায় দেশ ছিল, তা অর্জন করতে পারছে না।

প্রথম আলোর উপরে উল্লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিডিজবস ৩০ বছরের নিচে ২৫ লাখ তরুণের মধ্যে একটা সমীক্ষা করে দেখেছে, দেশের ৩০ বছর বয়সের নিচে ৫১ শতাংশ শিক্ষিত তরুণ এখন বেকার।

এদিকে ২০২৪-এর জুনে প্রকাশিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈশ্বিক জেন্ডার অসমতা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেন্ডার সমতা সূচকে গত বছরের চেয়ে বাংলাদেশে ৪০ ধাপ নেমে গেছে। ৬৮ দশমিক ৯ স্কোর পেয়ে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৯৯তম অবস্থানে আছে। আগের বছর ৭২ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫৯তম। এর ফলে এও দেখা যায়, বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা হিসেবে ভবিষ্যতে নারীদের সংখ্যা হবে বিশাল। যা আবার সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমিয়ে ফেলবে। শ্রমবাজারে বিপুল সস্তা নারী শ্রমিকের জন্ম দিবে এবং দেশ আবারও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে পড়ে যেতে পারে। এমনিতে গত ৫ বছরে শ্রমশক্তিতে জেন্ডার বৈষম্য বেড়েছে। নারী-পুরুষের আয়ে অসমতা ৫ গুণ বেড়েছে। কাজ পাওয়ার মতো প্রযুক্তিমুখী নারীশিক্ষায় বিনিয়োগের আগ্রহ গ্রাম পর্যায়ে কমে যাওয়ার মুখে সমাজে বহুমাত্রিক বৈষম্য বাড়ছে। এ অবস্থা আবার সরকারি চাকুরির প্রত্যাশা অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে চলেছে। যারই একটা প্রকাশ ছিল ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের আন্দোলন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে শুমারিতে বেকারের যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয় সেটা অতি উদার। সেটা যদি আরও বাস্তবসম্মত এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয় তাহলে দেশের বেকারত্বের প্রকৃত পরিসংখ্যানে বড় আকারে উলম্ফন ঘটতো। এখানে পরিসংখ্যান যোগাড়ের সময় ধরা হয়, বেকার জনগোষ্ঠী মূলত তাঁরা, যাঁদের গত ৭ দিনে কমপক্ষে ১ ঘণ্টাও কোনো কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। তবে পুরো সপ্তাহ কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং ৩০ দিনে বেতন বা মুনাফার বিনিময়ে কোনো না কোনো কাজ খুঁজেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী, যিনি কাজ করছেন অথচ প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না (সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করছেন না) তিনিই আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট।

রক্ষণশীল সংজ্ঞায় দেশে ছদ্মবেকারের সংখ্যা ৫০-৬০ লাখ হবে বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করে থাকেন। ডয়েসে ভেলে ২৭ আগস্ট ২০২৩ লিখেছিল, বাংলাদেশে কর্মক্ষম কিন্তু একেবারেই কোনো কাজে যুক্ত নন, এমন মানুষ আছেন চার কোটির উপরে।

পাঁচ লাখ নতুন কর্মসংস্থান?

এদিকে বছরের শেষ দিকে এসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেছেন আগামী দুই বছরে পাঁচ লাখ জনবল সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাবে। অনেকে এই সংখ্যাকে বেশ বড় বললেও, অনুসন্ধানে দেখা যায় দেশে সরকারি চাকরিতেই কেবল পদ খালি আছে ৫ লাখ ৩ হাজার ৩৩৩টি। সরকার চাইলে এসব পদে একাংশ পূরণ করতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক ঋণদাতাতের তরফ থেকে সরকারের উপর ব্যয় সংকোচন নীতির চাপ রয়েছে। ফলে প্রস্তাবিত বিপুল নিয়োগদান সম্ভবত কঠিন হবে। আগের সরকারের সময়ও সরকারি খাতে বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয় ২০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাবনা ছিল। ফলে এখন উল্টো কিছু করা বেশ দুরূহই হবে।

তবে একজন গবেষক এই মর্মে বলেছেন, (প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর ২০২৪) বাংলাদেশে যে কয়েক লাখ বিদেশী কাজ করছে তাদের জায়গাতেও অনেক বাংলাদেশীকে কাজ দেয়া যায়। যেমন, ২০২০ সালের স্পেশাল ব্রাঞ্চের তথ্যমতে,

বাংলাদেশে কাজ করা বিদেশীদের সংখ্যা ২ লাখ ৪৫ হাজার ৭৭৯। বাংলা ট্রিবিউন নামের দৈনিক ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর ২০২০-এর তথ্যমতে, এ দেশে ৩০ লাখের মতো (রোহিঙ্গাসহ) বিদেশী আছে। এর মাঝে অবৈধভাবে কাজ করছেন প্রায় ১০ লাখ বিদেশি। তবে এরকম সবাইকে চলে যেতে বলাও সমস্যাপূর্ণ। কারণ এরা যে দক্ষতার বিনিময়ে এখানে অবৈধ হয়েও কাজ পাচ্ছেন সেরকম স্থানীয় জনশক্তি বিরল– প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকায়। ফলে দ্রুত কয়েক লাখ বেকারকে কাজ দিতে হলে দেশে প্রশিক্ষণ অবকাঠামোতে বিপুল বিনিয়োগ দরকার।

অথচ বাংলাদেশে চিত্রটা উল্টো। এখানে মাধ্যমিক স্তরে কারিগরী শিক্ষার দিকে যাওয়া শিক্ষার্থী অতি নগণ্য। এ অবস্থা বদলাতে, সরকারকে শিল্পোদ্যোক্তাদের সঙ্গে মিলে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নকশা পরিবর্তন করতে হবে। তরুণদের জন্য ভালো বেতনের বৃত্তিমূলক চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে আইটি, ইলেকট্রনিকস সমাবেশ এবং নির্মাণের মতো সেক্টরগুলোতে মনোযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে আর্থিক সহায়তা পেলেন সাদিয়া আফরিন।

সাদিয়া আফরিন পেশা একজন গৃহিনী। তার স্বামী ছানোয়ার ইসলাম পেশায় একজন নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন্ । মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মোস্তফাগঞ্জ গ্রামের বিল্লাল হোসেনের বাড়ির সানসেটে দাড়িয়ে পানি নিষ্কাশনের পাইপ মেরামত করা অবস্থায় আকস্মিক সানসেটের উপর থেকে নিচে পড়িয়া যান। এই ঘটনায় তিনি স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ববরণ করেন। সিআরপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এসআরএস এর সহযোগিতায় চিকিৎসা সহায়তা চেয়ে গত ১০/০৫/২০২২ ইং তারিখে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে আবেদন করেন ছানোয়ার হোসেন। বিগত ২০২৩ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত কল্যান তহবিলের ২৭ তম বোর্ড সভায় তাকে ৬০০০০/– টাকা আর্থিক সহায়তার সুপারিশ করা হয় এবং আগস্ট মাসে মুন্সিগঞ্জ ডিসি অফিসে চেক বিতরন কালে দেখা যায় ইতিমধ্যে বিগত ২৬/০৫/২০২৩ ইং তারিখে ছানোয়ার অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাই তার নামে ইস্যুকৃত চেকটি সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। এই বিষয়ে ছানোয়ারের স্ত্রী সাদিয়া আফরিন এসআরএস এর সাথে যোগাযোগ করলে এসআরএস এর পক্ষ থেকে তার প্রয়োজনিয় কাগজপত্র তৈরি করে কল্যাণ তহবিলের মহাপরিচালকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। কল্যাণ তহবিলের মহাপরিচালকের সহযোগিতায় নতুন করে সাদিয়া আফরিনের নামে ইস্যু করা হয় এবং এবছর মার্চ মাসে মুন্সিগঞ্জ কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ অধিদপ্তর অফিসে থেকে চেক নেওয়ার সময় সাদিয়া আফরিনের জাতীয় পরিচয়পত্রের শেষ দুইটি নাম্বারের ডিজিট না মেলায় তাকে চেক প্রদান না করে পুনরায় ঢাকায় চেকটি ফেরত পাঠানো হয়। যদিও জাতীয় পরিচয়পত্রে ডিজিট এর ভুল কল্যাণ তহবিলের প্রিন্টিং ভুল ছিল । তারপর পুনরায় কল্যান তহবিলের মহাপরিচালকের সাথে যোগাযোগ করা হলে চেক টি গ্রহন করার জন্য ডাইফের প্রধান কার্যালয়ে আসতে বলা হয়। অবশেষে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে গত ১৫/০৫/২০২৪ ইং তারিখে ঢাকা শ্রম ভবন থেকে নিহত ছানোয়ারের স্ত্রী সাদিয়া আফরিনকে ৬০০০০/– টাকার চেক প্রদান করা হয়।

কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তিতে সাদিয়া আফরিনকে এসআরএস এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কল্যান তহবিলের এই সাহায্য তার পরিবারের আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কিছুটা হলেও সহায়তা করবে বলে আশা রাখছে এসআরএস।

ডাবল ডিজিট মূল্যস্ফীতি; শ্রমিক জীবনে নাভিশ্বাস দারিদ্র্য ঝুঁকিতে অদরিদ্ররাও

২০২৪ সালে বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি গত প্রায় এক যুগের মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অন্যান্য পণ্যেও মূল্যস্ফীতি বাড়ছিল এসময় ডাবল ডিজিট হারে। কোন কোন মিডিয়া জানিয়েছে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি এসময় সর্বোচ্চে পর্যায়ে ছিল।

বছর জুড়ে গড়ে ১০ শতাংশের বেশি হারে জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছিলো বিধায় শ্রমিকদের দৈনন্দিন ভোগ অনেক কমাতে হচ্ছিলো। কারণ এসময় খুব কম খাতেই শ্রমিক মজুরি বেড়েছে।

মজুরি না বাড়ায় বহু কিছু খাওয়া কমিয়ে এবং জীবনের অনেক প্রয়োজন ও শখ পূরণ না করে কেবল খাদ্যদ্রব্যের জরুরি আইটেমগুলো কিনতে হচ্ছিলো শ্রমজীবীদের।

এ অবস্থায় সরকার শহরগুলোতে তাদের ট্রাকসেল বাড়ায়, কম মূল্যের দোকানগুলো সক্রিয় করে।

উল্লেখ্য, অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবা না বাড়িয়ে টাকা ছাপালে টাকার মূল্য কমে গিয়ে মূল্যস্ফীতি ঘটে। সরলভাবে বললে ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বলতে বোঝায় যে পণ্য বা সেবার গত বছর ক্রয়মূল্য ছিল ১০০ টাকা, তা এখন ১১০ টাকা। শ্রমিক জীবনে এর আরেকটা অর্থ দাঁড়ায় তাঁদের প্রকৃত মজুরি ১০ শতাংশ কমে যাওয়া। যেমন, একজন শ্রমিক যদি গত বছরের হিসাবে দশ হাজার টাকা মজুরি পান, তাহলে ২০২৪ সালের পণ্য বাজারের হিসাবে তিনি মজুরি পাচ্ছেন আসলে পূর্ববর্তী বছরের হিসাবে নয় হাজার টাকার মতো।

প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়া এবং ভোগ কমার কারণে খাদ্য গ্রহণের হিসাবে অনেক শ্রমজীবী পরিবার এ বছর নতুন করে দরিদ্র পরিচয়ের পরিমন্ডলে প্রবেশ করেছেন।

বিগত সরকারের আমালে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির ভিত্তি ছাড়া বারবার টাকা ছাপানোর কারণে মূল্যস্ফীতি ত্বরান্বিত হয় এবং সেটা ২০২৪ এর শেষেও অব্যাহত থাকে। পাশাপাশি অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর নীতি মূল্যস্ফীতি কমাতে প্রয়োগকৃত অন্য নীতিগুলোর বিপরীতে কাজ করে।

খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি তথা ওএমএসের নতুন নীতিমালা

অক্টোবর মাসে খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি (ওএমএস) নীতিমালা ২০২৪ জারি করে সরকার। অনিয়ম ও শর্ত ভঙ্গের জন্য ডিলারদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখে নতুন এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

একই সঙ্গে ২০১৫ সালের এ সংক্রান্ত নীতিমালাটি বাতিল করা হয়েছে। ২০১৫ সালের নীতিমালায় ওএমএস ডিলারদের অনিয়ম কিংবা শর্ত ভঙ্গের জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না।

নতুন নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোনো শর্ত লঙ্ঘন করলে বা দেশের প্রচলিত কোনো আইন অমান্য করলে ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে এবং অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করা যাবে। ওএমএস ডিলার তার অনুকূলে বরাদ্দ করা খাদ্যশস্য কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া যথাসময়ে উত্তোলন না করলে তার ডিলারশিপ বাতিল বা জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

নীতিমালা সংশোধনের পাশাপাশি সরকার এসময় ওএমএসে সজি বিক্রিরও সিদ্ধান্ত নেয়। এসময় ওএমএসের দোকানগুলোতে চিরাচরিত লাইনও অনেক লম্বা হতে দেখা যায়। সবজি বিক্রির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেয় কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রাথমিকভাবে ১০টি জায়গায় এই উদ্যোগ নেয়া হয়।

তবে এসময় ৭ ডিসেম্বর প্রথম আলোর এক সংবাদে দেখা যায় টিসিবির ডিলার বা পরিবেশক নিয়োগে অনিয়ম বন্ধ হয়নি এখনও। পূর্ববর্তী শাসনামলে মূলত রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনায় এ খাতে ডিলার নিয়োগ দেয়া হতো। ফলে 'গরীব কার্ড' প্রণয়নের কাজেও রাজনীতির প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এবার যখন নতুন করে ডিলার নিয়োগ শুরু হয় তখন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কাজটি করা হয়নি। এতে ডিলার হতে ইচ্ছুক জানতে পারেননি বা সুযোগ পাননি। বিশেষ করে যারা গত সরকারের আমলে এরকম কাজ পাননি রাজনৈতিক বিবেচনায়।

উল্লেখ্য, দেশে টিসিবি'র পরিবেশক আছেন ৮ হাজার ২৭৩ জন। এসব পরিবেশক থেকে কার্ডধারী ব্যক্তিরা প্রতিমাসে ১০০ টাকা দরে ২ লিটার ভোজ্য তেল, ৬০ টাকা দরে ২ কেজি ডাল এবং ৩০ টাকা দরে ৫ কেজি চাল পান। পরিবেশকরা কমিশন পান কেজি প্রতি ৫ টাকা।

শুল্ক কমানো হয়, কিন্তু দাম কমে না

টিসিবিকে প্রসারিত করার পাশাপাশি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ডিম ও চিনির দাম কমাতে সরকার আরও কিছু উদ্যোগ নেয়। সরকার ডিমের সরবরাহ বাড়াতে বাড়তি আমদানি এবং কিছু নিত্যপণ্যের শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর অংশ হিসেবে চিনির শুল্ক কমানো হয়। গত ৯ অক্টোবর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চিনি আমদানিতে শুল্ক ৩০ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করে। অপরিশোধিত চিনির আমদানি খরচ প্রতি কেজিতে ১১ টাকা ১৮ পয়সা এবং পরিশোধিত চিনির খরচ ১৪ টাকা ২৬ পয়সা কমানো হয়। তবে এরপরও এসব পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমছিল না।

এর কারণ সম্পর্কে ১৮ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক বরকত-ই-খুদা বলেন, 'মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার জন্য সরবরাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সরবরাহ থাকলে সেক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে সিন্ডিকেট, যা অনেক দিন ধরেই দেশে চলছে। পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরও সাধারণ মানুষ বাজারে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কিনতে পারছে না। সিন্ডিকেট করে কৃত্রিমভাবে পণ্যের দাম বাড়ানো হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি কমাতে হলে তথ্যের যথার্থতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে।'

অসমতার হ্রাসের অঙ্গীকার যখন নিম্নগামী

এদিকে জাতীয় অর্থনীতি ও শ্রম অর্থনীতির উপরোক্ত টানাপোড়েনের ফল কি দাঁড়াচ্ছে সেরকম এক বার্তা পাওয়া গেলে বছরের শেষ মাসে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে। ৭ ডিসেম্বর বিআইডিএসের অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সার্জিও অলিভিয়ারি জানান, এখানে প্রতি পাঁচটি অদরিদ্র পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার তথা ২০ শতাংশ পরিবার দেশে দরিদ্র হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে। ২০২২ থেকে অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় নানান ঝুঁকিতে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। বর্তমান খাদ্যমূল্যের অস্থিরতাকে দেশের নীতিনির্ধারকদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেন তিনি। তাঁর মতে, এ সমস্যার টেকসই সমাধান হলো নীচুতলার মানুষের আয় বৃদ্ধির দিকে মনযোগ দিতে হবে। এ জন্য তাঁর পরামর্শ তিনটি: মানসম্মত শিক্ষায় বিনিয়োগ, সরবরাহ খাতের অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাড়ানো। বিআইডিএসের এই দিনের অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানও ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন, উচ্চ বৈষম্যের সমাজে যেসব লক্ষণ থাকে বাংলাদেশে তা দেখা যাচ্ছে। এখানে বৈষম্য ছড়াচ্ছে রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমেই। (প্রথম আলো, ৮ ডিসেম্বর ২০২৪)

এদিকে বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা যখন বাংলাদেশের নীচুতলার শ্রমজীবীদের মজুরি বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছিলেন তখনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র এক প্রতিবেদনে জানা গেল শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি দেয়ার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। নভেম্বরে প্রকাশিত আইএলওর গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্টে ২০২৪-২৫ বলা হয়েছে, দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় ২৫ দশমিক নয় শতাংশ শ্রমিক স্বল্প মজুরি পেয়ে থাকেন, ভুটানে এই অনুপাত ১৩ দশমিক আট শতাংশ। বাংলাদেশে শ্রমিকদের মধ্যে স্বল্প মজুরির শ্রমিকের অংশ ১১ দশমিক দুই শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানে স্বল্প মজুরির শ্রমিকের অনুপাত সবচেয়ে কম– নয় দশমিক চার শতাংশ। এরপর আছে ভারত এবং দেশটির অনুপাত ১১ দশমিক পাঁচ শতাংশ।

অপর দিকে আইএলও'র এই প্রতিবেদন প্রকাশের আগের মাসে (অক্টোবরে) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম তাদের গবেষণার সূত্রে জানিয়েছে, বিশ্বের যেসব দেশে শ্রম অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এই কাতারে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আফগানিস্তান, জর্ডান ও জিম্বাবুয়ে।

অক্সফামের এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের সবচেয়ে নিচের ১০টি দেশের কাতারে। এই সূচকে ১৬৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম। সেই সঙ্গে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায়ও বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে তলানির ১০ দেশের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম।

অন্যদিকে, অসমতা হ্রাসের অঙ্গীকার সূচকে বাংলাদেশ চলতি ২০২৪ সালে ১৭ ধাপ পিছিয়ে ১২৪ তম স্থানে নেমে গেছে। ২০২২ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১৭ তম। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে ১৪৮তম ও ২০২০ সালে ১১৩তম স্থানে ছিল।

(দৈনিক বণিকবার্তা, ২২ অক্টোবর ২০২৪)

সীতাকুন্ডে জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে বিস্ফোরণে পরিদর্শনে থাকা শ্রমিক কর্মচারি হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যর্থ মালিকের বিচার ও শাস্তি দাবি।

— সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

গত ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নের শীতলপুর সাগর উপকূলে এসএন করপোরেশন জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ঐ কোম্পানীর ১২ সদস্যের পরিদর্শক দল অগ্নিদগ্ধ হয়। এই দুর্ঘটনায় ঐ কোম্পানীর ২ জন কর্মচারি নিহত হয়েছেন এবং বাকিরা জন গুরুতর আহত হয়ে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাষ্টিক সার্জারি ইনষ্টিটিউট এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ মালিকের বিচার ও শাস্তি দাবি করছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় এসএন কর্পোরেশনের একটি পরিদর্শন দল তেলবাহী ট্যাঙ্কার জাহাজভাঙার কাজ শুরুর আগে পরিদর্শনে যান । হঠাৎ জাহাজের অকটেনের পাইপ বিস্ফোরণে সবাই অগ্নিদগ্ধ হয়। এসআরএস মনে করে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সেক্টরগুলোর মধ্যে জাহাজভাঙা শিল্প অন্যতম। প্রতিবছর এই শিল্পে কর্মদুর্ঘটনায় বহু শ্রমিক প্রাণ হারায়। সীতাকুন্ডের এই দুর্ঘটনায় প্রমাণ করে জাহাজভাঙা সেক্টরটি কতটা ঝুঁকিপূর্ন। এসআরএস অবিলম্বে জাহাজভাঙা শিল্পের ঝুঁকিগুলি নিরূপন করে তা প্রতিরোধে যে সকল আইনী বিধি বিধান আছে তা প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সেই সাথে যে সকল মালিকরা এই বিষয়ে অবহেলা করছে তাকে বিচার ও শাস্তির আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছে এসআরএস । একইসাথে এসআরএস দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে ।

মিরণজিল্লার দলিতদের ভূমির আন্দোলন নজর কাড়লো দেশব্যাপী

জাতীয় সংস্কার ভাবনায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বৈষম্যও দূর করার দাবি

বাংলাদেশে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা হরিজন বা দলিত নামেও পরিচিত। ব্রিটিশ আমলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চা-বাগানের কাজ, জঙ্গল কাটা, পয়োনিষ্কাশন প্রভৃতি কাজের জন্য ধাপে ধাপে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে দরিদ্র দলিত মানুষকে এ দেশে আনা হয়। তাঁদের তখন থাকতে দেওয়া হতো কাজের জায়গার আশেপাশে, কলোনিতে। আবার এদের আনা ও রাখার পরও প্রশাসন ও মূলগোষ্ঠীর একাংশ এদের সেবা নিতে প্রস্তুত থাকলেও তাদের সঙ্গে জলচল করতে অনিচ্ছুক ছিল না।

যে নামেই ডাকা হয় এই জনগোষ্ঠীর পেশাগত স্বার্থ, সমস্যা ও সম্ভাবনা একই রকম। দু'তিন দশক আগেও বাঙালি সমাজে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শনাক্ত করার বেলাতে অনেকের অনীহা ছিল। সারা দেশে যে এরকম ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠী রয়েছে সেটা বাংলাদেশে অনেকেই জানতে বা স্বীকার করতে চাইতেন কম। সে অবস্থা বদলানোর পর এখন উদাসীনতার পর্যায় চলছে। অর্থাৎ এরকম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও আর্থিক জীবনের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে মনযোগ এখনও আশানুরূপ নয়। এমনকি গণঅভ্যুত্থানের মতো রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অবস্থা খুব একটা পাল্টায়নি। তবে দেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই সমাজের সংগঠনগুলো নবআঙ্গিকে নিজেদের দাবি-দাওয়াগুলো তুলে ধরেছে ২০২৪ সালে। বিশেষ করে এই জনগোষ্ঠী তাদের পুরানো এক প্রধান দাবি বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবিতে এই বছর সোচ্চার ছিল।

বৈষম্য বিরোধী আইন জাতীয় সংস্কার উদ্যোগে যুক্ত হোক

হরিজন বা দলিতদের মতোই সমাজে যেসব পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলার শিকার জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সবার স্বার্থে গত প্রায় এক দশক ধরে বৈষম্য বিরোধী একটা আইন করার চেষ্টা চলছে। মূলধারার সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিমন্ডল থেকে কোন না কোনভাবে 'বাদ পড়ে যাওয়া' জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা রেখে একটি অভিন্ন খসড়া আইন প্রণয়ন এবং তার দ্বারা বৈষম্যের শিকার সকল নাগরিকের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ তৈরি ছিল এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

নাগরিক সমাজের অনেক মানবাধিকার কর্মী এবং অনেক দলিত সংগঠন এরকম একটা আইন করার জন্য কাজ করছেন। সে লক্ষ্যে বহু সভা-সেমিনার হয়েছে। ২০২২ সালে জাতীয় সংসদেও এই আইনের একটা খসড়া উত্থাপিত হয়। যা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে পর্যালোচনার জন্যও যায়। এখন গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী জাতীয় সংস্কার ভাবনায় সেই বৈষম্য বিরোধী আইনটি বিবেচনা করা দরকার বলে মনে করছে হরিজন ও দলিত সমাজ। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের উপরোক্ত প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ভাষা, বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক, মানসিক বা তৃতীয় লিঙ্গ, জন্মস্থান, জন্ম, পেশা এবং অস্পৃশ্যতার অজুহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেকৃত ১২টি ক্ষেত্রে ১৫ ধরনের কাজ বা আচরণকে 'বৈষম্যমূলক' হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

হরিজনদের আদি পেশায় ৮০ ভাগ কোটায় নিয়োগ দেয়া হোক

সামাজিক বৈষম্যের বাইরে দলিতদের প্রধান সমস্যা হলো কাজের অভাব, আয়ের স্বল্পতা। পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে তাদের পুরানো কাজের জায়গা অন্যরা নিয়ে নিচ্ছে। যদিও

বিভিন্ন সিটি করপোরেশন/ পৌরসভাসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে নগরের সুচিতা আনার দায়িত্ব পালন করে আসছে এই জনগোষ্ঠীর মানুষ– কিন্তু এখন অনেক জায়গায় এই কাজগুলো আর তারা পাচ্ছে না বা তাদের দেয়া হয় না। যদিও বিগত শাসনামলে মৌখিক একটা নির্দেশ ছিল সরকারি পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে এরকম ৮০ ভাগ কাজ দলিতদেরই দিতে হবে। তারা এরকম একটা কোটা চায় এই কাজের নিয়োগে।

অন্যদিকে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর বাইরে যেসব দলিত গোষ্ঠী আছেন তাদেরও আয়রোজগারমূলক কাজ পাওয়ায় রয়েছে বিস্তর সমস্যা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে শ্রম সংস্কার কমিশন করেছে তাতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উপরোক্ত বিষয় এবং তাদের কাজের শোভন পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথেষ্ট সংস্কার সুপারিশ থাকবে বলে সকলে আশা করছেন।

আবার এরকম জনগোষ্ঠীসমূহের সবার জন্য বড় আয়তনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোন জাতীয় কর্মসূচিও নেই। বেদেসহ ১-২টি মাত্র সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে অতীতে সীমিত পর্যায়ের কিছু কর্মসূচি ছিল। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আসতে চায় এরকম সকল জনগোষ্ঠী।

খাসজমিতে পুনর্বাসন দাবি

সামাজিক বঞ্চনা, কাজের অভাবের পাশাপাশি হরিজন সমাজের বড় একাংশ আজন্ম ভূমি অধিকার বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার কথা ২০২৪ সালে পুরো দেশের মানুষ নতুন করে জানলো ঢাকার মিরন জিল্লা এলাকার দলিতদের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন থেকে। মিরন জিল্লা হলো হরিজন বা দলিত গোষ্ঠীর বেশ পুরানো একটা কলোনি এলাকা। কয়েক শ বছরের বসতি এখানে হরিজনদের।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২০২৪ সালের মে-জুনে মিরন জল্লা কলোনিতে বসবাসরত দলিত হরিজন সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের কোনোরকম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়ার পরই বড় এক সামাজিক আন্দোলনের জন্ম হয়। যাতে দলিতদের সঙ্গে সংহতি জানাতে এগিয়ে আসে বাঙালি সমাজের অনেক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীও। এরকম আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত হয়। তবে এই আন্দোলন একটা রূঢ় সত্য সামনে নিয়ে আসে– তাহলো দলিতরা শতাব্দির পর শতাব্দি এ দেশে থেকেও, এখানকার অর্থনীতির জরুরি অংশীদার হয়েও আজও থাকার জায়গায় অধিকার পেলো না। মিরন জিল্লা সুইপার কলোনিতে ৭ হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করেন বলে জানান সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা বলেন, সেখানে ৮ শ'র মতো পরিবার আছে।

গত বছর ২৮ জুন মিরন জিল্লা বসতি রক্ষা আন্দোলনের একজন কর্মী এবং সেখানকার বাসিন্দা ভয়েস অব আমেরিকাকে বলেন, 'ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের দাদার-দাদারা এখানে বসবাস করে আসছেন। সিটি করপোরেশন আমাদের উচ্ছেদ করে দিলে কোথায় যাবো? আমাদের নিজেদের কোনও জায়গা নেই। আমাদের কলোনিতে আমরা কোনও 'উন্নয়ন' চাই না। যে জায়গায় আছি সেটা আমাদের বুঝিয়ে দেয়া হোক। আগেকার একজন মেয়র (সাঈদ খোকন) ২টি ঝুকিপূর্ণ বিল্ডিং ভেঙে ভবন তৈরির কাজ শুরু করান। বলা হয়েছিল, এই দুই জায়গায় যে ৬০টি পরিবার থাকছে নতুন ভবনে তারা ঘর পাবে। কিন্তু পরের মেয়র এসে বললো যারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাচিবিক আদেশে চাকরি করছে শুধু তারাই ঘর পাবে। ফলে মাত্র ১৮টি পরিবার ঘরের চাবি পেয়েছে। বাকিদের মধ্যে ১৮টি পরিবার এখন স্কুলের ছাদে টিনশেড করে বসবাস করছেন। ৪টি পরিবার অতিথি ভবনের মধ্যে বাস করছেন। এভাবে আমাদের জায়গায় তৈরী ভবনে আমরাই যদি ঘর না পাই, সেই উন্নয়নের দরকার নেই।'

উল্লেখ্য, এই কলোনিগুলোতে গেলে দেখা যায়, ১০ ফিট বাই ১০ ফিটের ঘরে অন্তত ৪-৫ জন মানুষ থাকেন। তাঁরা শিফট করে ঘরে ঘুমান। দুইজন ঘুমালে বাকি ২ জন বাইরে কোথাও বা মন্দিরে গিয়ে বসে থাকেন।

মিরন জিল্লা এলাকায় আন্দোলনের মাঝেই দেশে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় এবং পুরানো সরকারের মেয়র পালিয়ে যান। এর পর থেকে এখানকার আন্দোলনও স্থিমিত হয়েছে। উচ্ছেদ উদ্যোগও থেমে গেছে। তবে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষরা গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই বলছেন, ঢাকাসহ সারাদেশে খাসজমিতে দলিত পরিবারগুলোকে ভূমি অধিকার দিয়ে পুনর্বাসন করা হোক।

সাংস্কৃতিক একাডেমি চায় দলিত সমাজ

জমি ও কাজের বাইরে হরিজন সমাজসহ দলিত সকল গোষ্ঠীর আরেক বড় সংকট হলো তাদের সকল জাতিগত সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের অনেক জনগোষ্ঠীরই ভাষার লিখিত রূপ তাদের হাতে নেই। সেই ভাষায় লেখাপড়ার চর্চা না থাকায় শুধু মুখের শব্দে তা কোনভাবে টিকে আছে। এছাড়া তাদের অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্পদ যুগের পর যুগের অনাদার

আর অবহেলায় চর্চাহীন অবস্থায় বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। এই অবস্থা থেকে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষায় অনেক দলিত একটা সাংস্কৃতিক একাডেমি প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাদের এই দাবি বিবেচনা করে দেখবেন বলে তাদের প্রত্যাশা। গত বাজেটকালে সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি বলেছিল: সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোর জন্য যেভাবে কয়েকটি ইনস্টিটিউট আছে সেভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন দলিতদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায়। শিল্পকলা একাডেমিকেও দলিত সংস্কৃতিমুখী প্রকল্প গ্রহণ করতে বাজেট নির্দেশনা দেওয়া দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক মদদ না থাকায় দলিত ভাষা ও সংস্কৃতি বর্তমানে টিকে থাকার সংকটে পড়েছে। অথচ তাদের সংস্কৃতি রক্ষা করে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভান্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের ছয় দফা দাবি

বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত পাস করতে হবে। আইনটি হলে এর প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিতে হবে; হোটেল-রেস্তোরাঁয় হরিজনদের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না; দেশের সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং বসবাসরত হরিজনদের স্থায়ী ও আধুনিক জীবনযাপনের সব সুবিধাসহ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে; সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সিটি করপোরেশন, পৌরসভাসহ সব প্রতিষ্ঠানে ৮০ শতাংশ কোটার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সব হরিজনকে চাকুরি দিতে হবে; পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদের লিখিত পরীক্ষার নিয়ম শিথিল করতে হবে; আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) এর ১২ দফা

১. 'বৈষম্য বিরোধী বিল ২০২২' সংশোধন করে অবিলম্বে পাস করতে হবে;

২. পূনর্বাসন ছাড়া দলিত কলোনী/পল্লী উচ্ছেদ করা চলবে না;

৩. জনপরিসরে দলিতদের প্রবেশাধিকারে বাধা দানকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. দলিত জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য জরুরীভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. সকল পরিচ্ছন্নতা কর্মীর চাকুরি স্থায়িকরণসহ সুনির্দিষ্ট পে-স্কেল দিতে হবে।

৬. 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র আওতায় দলিতদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

৭. দলিতদের প্রতি বৈষম্য নিরসনে বিভিন্ন পর্যায়ে 'সংরক্ষণ নীতি' প্রবর্তন করতে হবে।

৮. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনে সুরক্ষা উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না' সংবিধানের এই ধারার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. ভূমিহীন দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাসজমির বন্দোবস্ত করতে হবে।

১১. সকল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর জন্য মহানগর ও পৌরসভায় আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটিতে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

বাড়ছে বজ্রপাত

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ক্ষেতমজুর ও জেলেরা

বাংলাদেশে কৃষিখাতে সম্প্রতি এমন একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে যার সরাসরি ভুক্তভোগী হয়ে পড়ছে কৃষিশ্রমিকরা। সেটা হলো বজ্রপাত বেড়ে যাওয়া। বজ্রপাতের ফলে গত কয়েক বছর এরকম অনেক মানুষ মরে গেছে মাঠে-ময়দানে। এর পাশাপাশি ভুক্তভোগী হচ্ছেন জেলেরা, তাদের কাছে বজ্রপাতের পূর্বাভাস পৌঁছাতে পারছে না ঠিক সময়ে। তারা জীবন-জীবিকা নির্বাহের কাজে বাইরে যাচ্ছেন এবং যাওয়ার পরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

২০২৪ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কেবল মে মাসে বজ্রপাতে ৮০ ব্যক্তির মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছে পত্রপত্রিকায় (২৩ জুন প্রথম আলো)– যার মধ্যে ২০ জন ছিলেন সরাসরি কৃষিশ্রমিক। তবে বিগত বছরগুলোর মে মাসের তথ্য-উপাত্তে একই মাসে এর চেয়ে বেশি মানুষ মরার নজিরও আছে অন্তত দু'বার। এছাড়া দেশ রূপান্তর ৯ মে লিখেছে, বজ্রপাতে মৃত্যুর ৭২ শতাংশই হলো কৃষক।

বাংলাদেশে বজ্রপাত পরিস্থিতি এবং এতে হতাহতের ঘটনা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে বেসরকারি সংগঠন ডিজাস্টার ফোরাম। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে, ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে প্রাণ গেছে ৩ হাজার ৮৭০ জনের। অর্থাৎ প্রতিবছর ২৭৬ জনের বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছেন ২০২১ সালে, ৩৮১ জন। ওই বছরের মে মাসে বজ্রপাতে সর্বোচ্চ ১২০ জনের মৃত্যু হয়। ২০২৩ সালে পত্রিকায় বজ্রপাতে ২৮০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছিল।

সকলেরই হয়তো মনে আছে, ২০১৬ সালে বজ্রপাতে পুরো বছরে ১৭ জন মারা যাওয়ার সংবাদেই একে 'দুর্যোগ' ঘোষণা করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিস্থিতি যে সেই 'দুর্যোগে'র চেয়েও ভয়াবহ তা উপরের পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট।

ডেইলি স্টার গত বছর ৪ মে লিখেছে: 'জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর বজ্রপাতে গড়ে প্রায় ৩০০ মানুষ মারা যায়। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে বজ্রপাতের কারণে বছরে ২০ জনেরও কম মৃত্যু ঘটে।'

কেন

একই পত্রিকা এও লিখেছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে আবহাওয়ার ধরন ও বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যার ফলে দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ এবং ঋতু পরিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটছে। এ কারণেই বজ্রপাত বাড়ছে। বেশিরভাগ প্রাণহানি বর্ষা পূর্ববর্তী মৌসুম এবং বর্ষা ঋতুতে ঘটে, যার মধ্যে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। এমনও তথ্য মিলছে যে বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বিশ্বের যেকোন দেশের চেয়ে বেশি। পত্র-পত্রিকার সংবাদভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মূলত বজ্রঝড়গুলো হয়েছে সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, পটুয়াখালী, শরীয়তপুর, নেত্রকোণা ও চাঁদপুরে। এর বাইরে পাবনা, নওগাঁতেও মানুষ মারা গেছে।

সমাধান?

সমাধান হিসেবে বিশেষজ্ঞরা অনেকে উঁচু হয় এমন জাতের গাছ লাগানোর কথা বলছেন। একই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এম

এ ফারুখ বলেন, ‘বজ্রপাত এমন একটি দুর্যোগ আমরা চাইলেই এটি ম্যানিপুলেট বা কন্ট্রোল করতে পারি না। কোনো একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় বজ্রপাতকে আটকে রাখার মতো প্রযুক্তি আমাদের এখনো নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে এটা এখন সম্ভব। আলাস্কা, কানাডার মতো জায়গায় যারা আবহাওয়ার রূপান্তর ঘটাতে পারে ও একে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। সেটা করতে পারলে বজ্রপাতে মৃত্যু সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ ধরনের প্রযুক্তি আমাদের দেশে প্রচলন ও এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমাদের আরও সময় দরকার।’

বজ্রপাতের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ গওহার নঈম ওয়ারা বলেন, বাংলাদেশে বজ্রপাতের সংখ্যা বাড়েনি, মৃত্যু আগের চেয়ে বেড়েছে। তাঁর মতে,

বজ্রপাতে মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ বড় গাছ কেটে ফেলা। তিনি বলেন, ‘আমরা সব গাছ কেটে ফেলছি। বড় গাছ কিছু নেই এখন আর। এটাই মূল কারণ। আবার জনসংখ্যাও আগের থেকে বেড়েছে। সেটাও একটা কারণ।’

গ্রাম পর্যায়ে বজ্রপাত সমস্যার একটা বড় দিক হলো চিকিৎসার অভাব। এমনকি মানুষ জানেও না এই সমস্যার মোকাবেলায় করণীয় কী। গওহার ওয়ারার ভাষায় বজ্রপাতে আহত কাউকে হাসপাতালে নেওয়া হলে কী চিকিৎসা দেওয়া হবে, এর কোনো প্রটোকল নেই। উপসর্গ দেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বজ্রপাতে যারা মারা যান, তাদের বেশিরভাগ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ। সেজন্য এই বিষয়ে নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। এটাকে দুর্যোগের তালিকার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। মরে গেলে দাফনের জন্য অর্থ দেওয়া হয়। ব্যস কাজ শেষ!

একই বিষয়ে দেশ-রূপান্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ২০২৪ সালের ৯ মে আন্তর্জাতিকভাবে বজ্রপাত নিয়ে গবেষণা করা অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আশরাফ দেওয়ান বলেন, খোলা আকাশের নিচে থাকলেই

বজ্রপাতে মৃত্যু ২০১০-২০২৪

বছর	মোট মৃত্যু	শিশু	নারী	পুরুষ	আহত
২০২৪	১২৮ *১০ জুন পর্যন্ত	-	-	-	-
২০২৩		৪৬	২৩	২১০	১০৭
২০২২	৩১৬	৫১	৩৩	২৩২	১৩৭
২০২১	৩৬২	৭২	৪২	২৪৮	১২২
২০২০	৩৮১	৮১	২৯	২৭১	১৩৩
২০১৯	২৩০	৩৮	২৯	১৬৩	১৩১
২০১৮	২৭৭	৪৬	৪০	১৯১	৯৫
২০১৭	৩০২	৫৫	৪৬	২০১	৭৪
২০১৬	৩৫০	৭৯	৫১	২২০	১৯৬
২০১৫	২৭৪	৫৪	৩৬	১৮৪	
২০১৪	২১০	৩৯	২৮	১৪৩	
২০১৩	২৮৫	৫৫	৫৩	১৭৭	
২০১২	৩০১	৬১	৫০	১৯০	
২০১১	১৭৯	৩১	২৮	১২০	
২০১০	১২৩	১৮	২০	৮৫	

বজ্রপাতে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। আর খোলা আকাশের নিচে থাকে আমাদের শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষকরা। ড. আশরাফ দেওয়ান বলেন, ‘আমাদের দেশে ভোরের দিকে দেশের হাওর (সিলেট, শ্রীমঙ্গল, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা) অঞ্চলের কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যায়। তখন ওই এলাকায় বজ্রপাতে কৃষকরা বেশি মারা যায়। এ ছাড়া মাছ ধরতে যারা বাইরে যায়, কিংবা সন্ধ্যার সময় কাজে বাইরে থাকে তারাই বজ্রপাতে মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে।’ এছাড়া আবহাওয়াবিদরা আরও জানান, সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা, বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ, নদীর চর এলাকা, নদীর আইল বা সাগরের পাড় এলাকায় যেখানে উঁচু কোনো স্থাপনা বা বৃক্ষ নেই সেসব এলাকায় বজ্রপাতের সময় মানুষ থাকলে তারা মৃত্যুঝুঁকিতে থাকে।

শোভন কর্ম পরিবেশের জন্য দরকার ইটিপি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার কৃষি নদী ও জলাশয় নির্ভর। প্রকৃতি সেভাবেই এই জনপদ গড়েছে। এখানকার নদী, খাল, বিল প্রোটিনেরও বড় যোগানদার। এই দুইয়ে মিলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার বড় শর্ত এখানকার জলসম্পদকে দূষণমুক্ত রাখা। আবার দেশকে শিল্পায়নের দিকে নেয়ারও আবশ্যকতা রয়েছে। এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে যেয়ে এটা ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই যে, এখানে শিল্প মাত্রই হতে হবে বর্জশোধন নির্ভর। কোন কারণেই শিল্পের জন্য জলসম্পদকে দূষিত হতে দেয়া যাবে না। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাহীন শিল্পের বাজার সম্ভাবনাও ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। আবার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন শিল্প শ্রমজীবীদের শোভন কর্ম পরিবেশও নিশ্চিত করে। সেটাও শ্রমঘন ও ঘনবসতির দেশে অতি জরুরি। অর্থাৎ সব মিলে নদীনালা, শিল্পায়ন ও শোভন কর্মপরিবেশের একটা সঠিক সমন্বিত ধরনই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ।

কিন্তু ঘটছে উল্টোটা। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা সার্ভিসে ২০২৪ এর ২ মে পিনাকি রায় লিখেছেন: বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে ১১৫টি নদী হারিয়ে গেছে। মুশকিলের দিক হলো বাকি নদীগুলোও এখন মৃত্যু পথযাত্রী। অনেক নদীর পানির দিকে তাকানো যায় না। কাছে যাওয়া আরও অসহনীয়। টেক্সটাইল ও নানান শিল্পবর্জ্যে এসব জলাধারের পানি দুর্গন্ধযুক্ত কুৎসিৎ এক তরলে পরিণত হয়েছে। যার মাঝে কোন প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয় আর। দুর্ভাগ্যের কথা কেবল ঢাকা, চট্টগ্রামের আশেপাশের নদী নয়, সুদূর প্রান্তিক জেলাগুলোর নদীও দূষণে দূষণে প্রায় মৃত অবস্থা। এসব নদীর পানিতে অক্সিজেনের পরিমান খুবই কম।

যদিও পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী, নদী ও জলাশয় হারানোর বড় কারণ এর বেদখল হওয়া– কিন্তু নদী সন্নিহিত এলাকায় বড় ও মাঝারি নানান শিল্পের বর্জ্য শোধন ব্যবস্থা জলসম্পদ ধ্বংসের আরেক বড় কারণ হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্রই সহজে চিহ্নিত করা যায়। শিল্পাঞ্চলগুলোতে বর্জ্য সরাসরি আশেপাশের জলাশয়, নদী ও খালে ফেলা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এরকম কারখানা শনাক্ত করে বটে কিন্তু সেগুলোকে ইটিপি বা এপ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসাতে বাধ্য করতে পারে সামান্যই। সরকারের দৃঢ় ও কঠোর অঙ্গীকার ছাড়া এ অবস্থা বদলানো সম্ভব নয়। অনেক সময় পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জরিমান করে ইটিপি বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করলেও তার সুফল সামান্যই পাওয়া গেছে।

২০২৪ সালের ৪ জানুয়ারি প্রথম আলোয় এক প্রতিবেদনে দেখা যায় কেবল সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলায় ২২৫ টি তাঁত কারখানার সঙ্গে প্রায় তিন শ ডাইং কারখানা আছে। এখানে দৈনিক গড়ে এক হাজার লিটার তরল বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে। যা কোন রকম শোধন ছাড়াই আশেপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে ইটিপি আছে দশেরও কম কারখানায়। কয়েক লাখ টাকা খরচ হবে সেই হিসাবে অন্যরা এই ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। যার বলি হচ্ছে আশেপাশের প্রতিবেশ। অর্থাৎ, ইটিপির পেছনে বিনিয়োগে আগ্রহী নন তাঁরা। তার জন্য কঠোর কোন তদারকি বা প্রাতিষ্ঠানিক চাপও নেই তাঁদের উপর। এভাবে নানান শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের নদী সম্পদ, জমি, ভূগর্ভস্থ পানি এবং বিশেষভাবে সমাজে শোভন কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অথচ টেকসই উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ পরিবেশের স্বার্থে শোভন কর্মপরিবেশের বিকল্প নেই। আজকের দিনে শ্রম পরিবেশের বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ যে ইমেজ সংকটে আছে তার বড় কারণ তার শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি।

ইটিপি না থাকায় জল ও জমির বাইরে সরাসরি শহুরে জনস্বাস্থ্যও মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ছে এখন। কিছুদিন আগে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জানালো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতালের পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য এবং রিসাইকেল (পুনঃচক্রায়নযোগ্য) বর্জ্য বিক্রয় করা হচ্ছে শহরাঞ্চলে। টিআইবি'র অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বর্জ্য সরানোর জন্য নির্ধারিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিকিৎসা বর্জ্যের অবৈধ ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বর্জ্য নষ্ট না করে কালোবাজারে বিক্রি করে দেয়। একটি সুপরিচিত ঠিকাদার এসব ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের আয়ের অন্যতম উৎস চিকিৎসা বর্জ্য বিক্রয়। অথচ এটা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিভরা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ হিসেবে টিআইবি দেখেছে, বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট রঙের পাত্রের ঘাটতি রয়েছে। চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য ৬টি নির্দিষ্ট রঙের পাত্র রাখার নির্দেশনা থাকলেও টিআইবির জরিপকৃত হাসপাতালের ৬০ শতাংশে তা ছিল না। এসব হাসপাতালের অভ্যন্তরে যত্রতত্র বর্জ্য ফেলা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্জ্যকর্মীরা সব ধরনের বর্জ্য একত্রে বালতি বা গামলায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পূর্ণাঙ্গ ইটিপি না থাকায় দেশের যেসব শিল্পখাত তীব্র ইমেজ সংকটে ভুগছে তার মধ্যে সর্বাগ্রে আছে চামড়া খাত। ঢাকার কাছের সাভারে চামড়া শিল্পনগরীতে আজও বর্জ্যের পুরোটা ইটিপির আওতায় আনা যায়নি। ফলে এই খাতের ব্যবসা আন্তর্জাতিক পরিসরে বড় আয়তনে বিকশিত হতে পারছে না।

চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য। এ খাতের পণ্য থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর ১৩৩ কোটি বা ১৩ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে পুরো খাতের সম্ভাবনা আরও বড়।

এখানকার শ্রমিক সংগঠকরা বলছেন, 'চামড়া খাত ভালো না করার একমাত্র কারণ সিইটিপিসহ কমপ্লায়েন্সের অভাব। পরিবেশগত বিষয়ে জোর দিতে হবে। কমপ্লায়েন্স না হওয়ার কারণে ব্যবসার সম্ভাবনার ৩০ শতাংশ কম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। উল্লেখ্য, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার সময় দুই ধরনের বর্জ্য পাওয়া যায়। এক হলো কঠিন ও দুই হলো তরল বর্জ্য। সাভারসহ যেখানেই চামড়া কারখানা আছে সেখানেই এই দুই ধরনের বর্জ্যের পরিপূর্ণ শোধন না হওয়া নিয়ে আশেপাশের জনপদের মানুষের বিপুল ক্ষোভ আছে। চামড়া শিল্পের বর্জ্যে নদী ও বায়ু দূষণ হচ্ছে ব্যাপক মাত্রায়।

উল্লেখ্য, দেশের অনেক শিল্পাঞ্চলের অনেক খাতের কারখানায় ইটিপি থাকলেও সেগুলো মালিকরা ব্যবহার করেন না বলেও পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়ে থাকে নিয়মিত। এক্ষেত্রে নারায়নগঞ্জ জেলার বিশেষ কুখ্যাতি রয়েছে। এই জেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর দুইপাড়ে ১১০ কিলোমিটারজুড়ে ২ হাজারেরও বেশি ছোট-বড় শিল্প কারখানা রয়েছে। এসব শিল্প কারখানার কেমিক্যালযুক্ত অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি শীতলক্ষ্যা নদী দূষণ করছে। শীতলক্ষ্যার সাথে সাতটি নদীর সংযোগ। ২৬টি খাল আছে এখানে, অসংখ্য পুকুর আছে। ফলে শীতলক্ষ্যার দূষণ এই জেলার কৃষি ও মৎস্য সম্পদের ভয়াবহ ক্ষতি করে চলেছে।

এদিকে খোদ পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে, জেলায় দুই হাজারের অধিক পোশাক কারখানার মধ্যে কেবল ৬০০ ডাইং কারখানায় ইটিপি বা বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে। সেগুলোরও সবকটি কার্যকর নয়। পরিবেশদূষণের অভিযোগে বিভিন্ন কারখানায় অভিযান চালিয়ে জরিমানা, গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্নের মতো ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কিছুদিন পর আবার চালু হচ্ছে সেই কারখানাগুলো।

ইটিপিহীন শিল্প বর্জ্য কীভাবে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের ক্ষতি করছে তার একটা বড় নজির গাজীপুর জেলা। এ বিষয়ে ২০২৪ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় প্রতিবেদক মাসুদ রানা লিখেছেন:

গাজীপুরের মুক্ত জলাশয়ের সুস্বাদু মাছে একসময় রাজধানী ঢাকার আমিষের চাহিদা মিটত অনেকখানি। নদী-বিলে মাছ ধরে সংসার চালাতেন প্রান্তিক জেলেরা। কিন্তু শিল্পকারখানার বর্জ্যে মুক্ত জলাশয়ের মাছের পরিমাণ দিন দিন কমছে। কারখানার আশপাশের জমিতে কমছে ফসলের উৎপাদন। গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকার শত শত শিল্পকারখানার তরল বিষাক্ত বর্জ্য পরিশোধন ছাড়াই বাইরে ফেলা হচ্ছে। সেই দূষিত পানি ও বর্জ্য গিয়ে পড়ছে তুরাগ নদ ও খাল-বিলে। এ কারণে আশপাশের জলাশয় ও ফসলি জমি নষ্ট হচ্ছে। প্রতিকার চেয়ে এলাকাবাসী বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ দিলেও কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি পরিবেশ অধিদপ্তরকে।

জেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৪ বছর আগে গাজীপুরের মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হতো ২০ হাজার ৩৬১ মেট্রিক টন। বর্তমানে মুক্ত জলাশয়ে এই মাছের উৎপাদন কমে ১ হাজার ৯৫৩ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে।

নগরের কোনাবাড়ী এলাকায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনে (বিসিক) ডাইং ও ওয়াশিং কারখানা রয়েছে ১০টি। সরেজমিন দেখা গেছে, কারখানার প্রধান ফটকের সামনের নালা দিয়ে কুচকুচে কালো পানি ফেলা হচ্ছে।

গণঅভ্যুত্থানের পর ওষুধ শিল্পে মজুরি বাড়াতে শ্রমিক আন্দোলন

বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পখাতে শ্রমিক আন্দোলনের নজির বিরল। ২০২৪ এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে সেটাই হলো।

৫ আগস্ট কোটা আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ার পর গাজিপুর-আশুলিয়া অঞ্চলে প্রথম বড় ধরনের যে শ্রমিক আন্দোলন হয় তাতে ঔষুধ খাতের শ্রমিক-কর্মচারিরাও বড় আকারে শরিক হয়েছিল। এই আন্দোলন ছিল মূলত কর্মবিরতিভিত্তিক।

আন্দোলনকালে বেক্সিমকো এবং স্কয়ার ফার্মার মতো খ্যাতনামা কোম্পানিসহ প্রায় ১৫-২০টি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা ২১ দফা দাবিতে কর্মবিরতিতে যায় এবং ঘোষণা দিয়ে কারখানার সামনে অবস্থান নেয়। এরকম অবস্থান ধর্মঘট বেশ কয়েকদিন চলে।

উল্লেখ্য, ওষুধ শিল্প সমিতির মতে বাংলাদেশে প্রায় ৩০০ ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে সচল কারখানার সংখ্যা প্রায় ২০০। দেশের ওষুধের চাহিদার প্রায় ৯৮ ভাগ পূরণ করে এসব কারখানা। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওষুধ বিক্রি করে স্থানীয় কয়েকটি কোম্পানি। প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে এই খাতে।

কিন্তু দীর্ঘদিন এসব কারখানার শ্রমিকদের মাঝে নানান ধরনের দাবি-দাওয়া থাকলেও তারা সেগুলো প্রকাশের সুযোগ পাননি। আর্থিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানের মাধ্যমে ওষুধ খাতের মালিক শ্রেণি জাতীয় রাজনৈতিক ও নীতিনির্ধারণী নেতৃবৃন্দের উপরও ব্যাপক প্রভাব রাখেন।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে শ্রমিক সমাজ বিভিন্ন উপায়ে তাদের দাবি তুলে ধরতে শুরু করেন।

ওষুধ শিল্পের শ্রমিকদের দাবির মধ্যে প্রধান ছিল সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন করা, বেতন বৃদ্ধি, দুই বছর পরপর পদোন্নতি, উৎসব ছুটি দশ দিন করা এবং অনিয়মিত শ্রমিকদের চাকুরি নিয়মিতকরণ। উল্লেখ্য, এসব কারখানায় দুই ধরনের শ্রমিক কাজ করে। একদল চুক্তিভিত্তিক। অন্যদল স্থায়ী। উভয় ধরনের শ্রমিকরাই কারখানাভেদে তাদের মূল বেতনের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি উত্থাপন করে। তারা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনেরও দাবি জানায় এবং কর্মস্থলে থাকাকালে মুঠোফোন ব্যবহারের সুযোগ চাইছিল।

আন্দোলনের মুখে কোন কোন কারখানার মালিক দাবি পূরণে অপরাগতা প্রকাশ করে পরিস্থিতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছিলেন বারবার। আবার কোন কোন মালিক দাবি মেনে কারখানা চালু রাখেন। তবে কিছু কিছু কারখানায় অনেক কর্মকর্তা নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে কারখানায় আসেননি।

কিছু কিছু কারখানার আশেপাশে সেনাবাহিনীও মোতায়েন করা হয়। তবে সেনাবাহিনী মূলত রাস্তা ও আশেপাশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। পপুলার ও বেক্সিমকোসহ কিছু কোম্পানি কিছু দাবি পূরণের মাধ্যমে দ্রুত তাদের কারখানায় শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হলেও স্কয়ার ফার্মাসহ কিছু কোম্পানিতে বেশ অনেকদিন ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। স্কয়ারে প্রায় ৬ হাজার স্থায়ী এবং এক হাজার অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করে থাকে।

স্কয়ার ফার্মার শ্রমিকরা ৩১ আগস্ট জাগো নিউজকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন ভাতাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে বৈষম্য করে আসছে। এসব বৈষম্যের প্রতিবাদে এবং ২১ দফা দাবিতে তারা আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দেন। যার মধ্যে ছিল কারখানার সামনে অবস্থান। পরে মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধও সৃষ্টি করে শ্রমিকরা। অবরোধের খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সেনাবাহিনী ও শিল্প পুলিশ গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মাহসড়ক থেকে সরিয়ে নিলে যান চলাচল শুরু হয়। তবে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলেও কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেছে কয়েক দিন।

উল্লেখ, ওষুধ কারখানার এসব ধর্মঘটের ঢেউ লাগে এসময় সিরামিক ও পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতেও। কোন কোন কারখানায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের অপসারণও দাবি-দাওয়ার মধ্যে ছিল।

এসব আন্দোলনের ফলে সেপ্টেম্বরের শুরুতে এক পর্যায়ে আশুলিয়া-গাজিপুর অঞ্চলে প্রায় দুই শত কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। প্রথম আলো'র ৬ সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে কেবল আশুলিয়ায় ১২৯টি কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণার কথা জানা যায়। গাজিপুরের কারখানাগুলোতে শ্রমিকরা কাজে ফিরেছে।

একই সময় আন্দোলনের কারণে আগস্টের শেষার্ধ থেকে অত্র এলাকায় যান চলাচলে মাঝে মাঝেই বিঘ্ন ঘটে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী হঠাৎ সৃষ্ট এই আন্দোলন সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ ৫ সেপ্টেম্বর লিখেছে:

বিভিন্ন দাবিতে কয়েকদিনের মতো বুধবারও (৪ সেপ্টেম্বর) বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছে শ্রমিকরা। এ কারণে গাজীপুর, সাভার ও আশুলিয়ায় ২৪৭ কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। আরও কিছু কারখানায় শ্রমিকদের দাবি নিয়ে অসন্তোষ চললেও তা সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন।

হঠাৎ সৃষ্ট এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা টহল চলমান রয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভোর থেকে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে সেনা মোতায়েন রয়েছে। একই সঙ্গে শিল্পপুলিশও বিভিন্ন স্থানে সতর্ক অবস্থানে থাকার পাশাপাশি টহল অব্যাহত রেখেছে। বুধবার পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির খবর পাওয়া যায়নি।

বিজিএমইএর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. খালেদ মনসুর সংবাদকে বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে পোশাক কারখানায় শ্রমিক নিয়োগে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনের দাবিতে চাকুরিবঞ্চিত বেকার যুবকদের গাজীপুর, ভোগড়া বাসট্যান্ড এলাকায় ঢাকা- ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করতে দেখা গেছে। এতে গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানা ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।'

৫ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন টিভির প্রতিবেদনে দেখা গেছে বৃষ্টির মাঝেও শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে যাচ্ছিলো। তবে পোশাক শ্রমিকদের দাবিগুলো ওষুধ শ্রমিকদের থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। ৫ সেপ্টেম্বর আশুলিয়ায় একটা পোশাক কারখানার শ্রমিক নয়ন শেখ ঢাকা পোস্টকে বলেছেন, আমাদের টিফিনের জন্য অনেক কম খরচ দেওয়া হয়। এছাড়া গাড়ি ভাড়া, ওভাটাইমের টাকা বৃদ্ধি, হাজিরা বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ ১০ দফা দাবি আছে আমাদের।

জাভেদ ও চম্পাঃ
বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিক বৈষম্যের দুই মেরু

[ভিন্ন শিরোনামে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনিস স্ট্যান্ডার্ডে ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর। বাংলাদেশের একটি পোশাক কারখানার মালিক পরিবারের সঙ্গে তাঁদের কারখানার খোদ শ্রমিকদের তুলনা হিসেবে এই প্রতিবেদনটি বেশ আলোচিত হয় গত বছর। সেই বিবেচনায় তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো: সম্পাদক]

২০২৩ সালে প্যারিসে বাংলাদেশের একটি ব্যবসায়ী পরিবারের পুত্র জাভেদ ব্যয়বহুল এক বিয়ের অনুষ্ঠান করেন। ঠিক তখন তাঁদের পরিবারের দেশীয় কারখানাটিতে শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করছিল।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্যারিসে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফ্যাশন আইকন রোজমিন মাধবজিকে বিয়ে করেন জাভেদ। বিলাসবহুল ওই অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভাইরাল হয়।

২০২৩ এ প্যারিসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিয়ের তালিকাতে ছিল জাভেদের অনুষ্ঠান। আয়োজনটি নজর কাড়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেরও। ভোগ ও ট্যাটলার ম্যাগাজিনে জাভেদের বিয়ের অনুষ্ঠানের খবর ছাপা হয় ফলাও করে।

অর্থবিত্তের এই জমকালো প্রদর্শনীর সময় দেশে জাভেদের পরিবারের মালিকানাধীন জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস লিমিটেডের শ্রমিকরা মাসের পর মাস বেতন না পেয়ে রীতিমতো ধুঁকছিলেন।

২০২৪-এর সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে এই কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভও করেন। এ বিক্ষোভ একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষও হয়। ৯ সেপ্টেম্বর কারখানাটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়। এসময় শ্রমিকদের বকেয়া বাকি ছিল তিন মাসের।

স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকদের বিক্ষোভ চলছিল তখনও। ২৩ অক্টোবর এখানেই শ্রমিক বিক্ষোভে আহত হন জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন এর শ্রমিক চম্পা খাতুন। ৬ দিন পর তিনি হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনা শিল্পাঞ্চলে নতুন করে বিক্ষোভ উস্কে দেয়। জেনারেশন নেক্সট পোশাক খাতে শ্রমিক অসন্তোষের একমাত্র কারণ না হলেও প্রতিষ্ঠানটি পরিস্থিতির অবনতিতে ভূমিকা রেখেছে।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অস্থিরতার মাঝে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহেশ্রমিক অসন্তোষ কমে আসছিল। এ সময় সব কারখানাই খোলা হয়, কয়েকটি বাদে। বন্ধ থাকা কারখানাগুলোর একটি হচ্ছে জেনারেশন নেক্সট। এই বন্ধ কারখানা এখনও বকেয়া বেতন পরিশোধ করেনি।

কোম্পানিটির সাবেক পরিচালক জাভেদ ও তার পিতা কোম্পানির বর্তমান চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন বলে অনুমান করা হয়। গুঞ্জন রয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগে শেয়ারহোল্ডার ও পরিচালক হিসেবে জড়িত জাভেদ। তিনি এজে কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান, ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড ও এসএস স্টিলের চেয়ারম্যান এবং জেনারেশন নেক্সট টেকনোলজিস লিমিটেডের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পোশাক খাত, রিয়েল এস্টেট, স্টিল উৎপাদনসহ বিভিন্ন খাতে তাদের পরিবারের ব্যবসা আছে।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে জাভেদ ও তার বাবা আত্মগোপনে চলে গেছেন বলে জানা গেছে।

জাভেদের বাবা তৌহিদুলের দ্বিতীয় স্ত্রী সাঈদা মুনা তাসনিমের (ব্রিটেনে শেখ হাসিনা সরকারের রাষ্ট্রদূত ছিলেন) মাধ্যমে শেখ হাসিনার পরিবারের সঙ্গে জাভেদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, সাঈদা জেনারেশন নেক্সটের শেয়ারহোল্ডার।

জাভেদ তৌহিদুলের প্রথম স্ত্রীর সন্তান।

সাঈদা মুনা তাসনিম ২০১৮ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োগ দেওয়া কূটনীতিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার তাকে দ্রুত দেশে ফেরার নির্দেশ দেয়।

তবে সাঈদা মুনা তাসনিম এ নির্দেশে কোনো সাড়া দেননি।

কূটনীতিকরা সাধারণত তিন বছরের জন্য একক মিশনে নিয়োগ পান। তবে শেখ পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সাঈদা মুনা তাসনিম যুক্তরাজ্যে প্রায় ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।

এদিকে এই পরিবারের পোশাক কারখানাটির কর্মকর্তারা জানান, জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর জেনারেশন নেক্সট শ্রমিকদের আবার বেতন জটিলতা শুরু হয়।

জুলাই মাসে শ্রমিকদের বেতন দিতে পারলেও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের বেতন দিতে পারেনি জেনারেশন নেক্সট। আগস্টে ৪ হাজার ৭০০ জনের বেশি শ্রমিক ও কর্মচারীর বেতন বকেয়া পড়ে। বর্তমানে বেতন বাবদ কোম্পানির কাছে শ্রমিকদের আনুমানিক বকেয়া ২১.৬৬ কোটি টাকা।

আগস্ট থেকে বেতন বকেয়া থাকলেও কারখানায় কাজ চালিয়ে গেছেন শ্রমিকরা। প্রথমদিকে কারখানার মধ্যেই বিক্ষোভ কিংবা বেতনের দাবিতে সোচ্চার হলেও গত সেপ্টেম্বর থেকে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় কর্মবিরতি। পরে আন্দোলন জোরালো হলে গত ২১ সেপ্টেম্বর সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। এর জেরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়। তারই এক পর্যায়ে চম্পার মৃত্যু ঘটে। এই গল্পের দুটি দিক– যা দুই ধরনের বাস্তবতা প্রকাশ করছে। একদিকে আলোঝলমলে জাভেদদের জীবন– অন্যদিকে, চম্পাদের নীরবে ঝরে যাওয়া।

চম্পার বৃত্তান্ত

জেনারেশন নেক্সট কারখানার কিছুটা দূরে দিয়াখালী উত্তরপাড়া এলাকায় পাকা দেয়ালের টিনের একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে চম্পা খাতুন মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে থাকতেন। পাশেই অন্যান্য কয়েকটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন চম্পার কয়েকজন সহকর্মী। একই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন চম্পার স্বামীর বড় ভাই মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি ২৮ অক্টোবর (২০২৪) প্রথম আলোকে বলেন, 'সবাই তো ন্যায্য দাবি জানাইছে। আন্দোলনে গিয়া চম্পা মারা গেল। চম্পারে রংপুরে তার বাবার বাড়িতে দাফন করা হইছে। তার ১৪ মাসের একটা মেয়ে আছে। এখন মা ছাড়া মেয়েটা থাকবে কীভাবে?'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২৩ অক্টোবর বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা সড়কে বিক্ষোভের একপর্যায়ে আশপাশের কারখানা ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েকটি টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল পুলিশ। তাতে আহত হন চম্পা।

ঘটনার দিন চম্পার খুব কাছে দাঁড়ানো আরেকজন শ্রমিক শরীফা খাতুন বলেন, 'চম্পা ও মোরশেদা আন্দোলনের সামনের দিকে ছিল। পুলিশ খুব কাছে ছিল। হঠাৎ জোরে শব্দ হইল। মনে হইছে বোমা মারছে, আগুনের দলা আইসা সামনে পড়ছে। ওই সময় চম্পা ও মোরশেদা পইড়া যায়। দৌড়াইয়া একটা বাসার সামনে গিয়া আমি পইড়া গেলে আরও চার-পাঁচজন আমার ওপরে আইসা পইড়া যায়। পরে মোরশেদারে হাসপাতালে নিয়া যায়। চম্পারেও অন্যরা হাসপাতালে নেয়।'

হ্যা, ঢাকা মেডিক্যালে চম্পা খাতুন মারা যান।

২০২৪ এর জন্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ৯ শতাংশের ঘোষণায় অসন্তুষ্ট পোশাক শ্রমিকরা

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বাড়বে ৯ শতাংশ হারে। অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট হবে ৯ শতাংশ। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে দীর্ঘ দর-কষাকষির পর বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, নিম্নতম মজুরি পুনরায় ঠিক না হওয়া পর্যন্ত পোশাক শ্রমিকেরা নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট পাবেন। ২০২৪ এর ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর হবে। ফলে শ্রমিকরা জানুয়ারির মজুরির সঙ্গে ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট যুক্ত হবে।

ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির কয়েকটি বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ছয় ও সরকারপক্ষের চার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিকপক্ষীয় প্রতিনিধিরা ইনক্রিমেন্ট দাবি করেছিলেন ১০ শতাংশ। অর্থাৎ জানুয়ারিতে মোট ১৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট চেয়েছিলেন তাঁরা।

মালিকপক্ষরা দিতে চেয়েছেন ৮ শতাংশ। পরে সবার সম্মতিক্রমে ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের সিদ্ধান্ত হয়। পরে এ বিষয়ে মালিক, শ্রমিক ও সরকারপক্ষের প্রতিনিধিরা এক যৌথ ঘোষণায় সই করেন। আলোচ্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এ এন এম সাইফুদ্দিন ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহাম্মাদ; জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুববিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম; বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কবির আহম্মেদ; শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক এস এম এমাদুর হক, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম পরিচালক মো. হাসিবুজ্জামান ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান সিকদার।

উল্লেখ্য, গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিকেরা টানা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বরে ১৮টি বিষয়ে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকনেতারা সমঝোতায় পৌঁছান। সমঝোতা অনুযায়ী, ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারকে প্রতিবেদন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

কিন্তু এই সমঝোতার পরদিনই এই সমঝোতা ভেঙ্গে যেতে দেখা যায় আশুলিয়ায়। সেখানে ২০-৩০টি কারখানায় শ্রমিকরা ১৫-২০ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করে। এই শ্রমিকরা একই সঙ্গে নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবি জানাচ্ছিলো। কর্মবিরতি শুরুর পর মালিকরা গণহারে কারখানাগুলোতে ছুটি ঘোষণা করে। ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর এ অবস্থা বজায় ছিল। এসময় সাভার এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তারাও পরিস্থিতি শান্ত রাখতে এবং সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন।

এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে জানুয়ারি থেকে ৯ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন পদমর্যাদার শ্রমিক ভেদে সর্বনিম্ন ৯০৫ টাকা থেকে ১ হাজার ১৩৩ টাকা পর্যন্ত মজুরি বাড়বে পোশাক খাতের কারখানাগুলোকে।

বিতর্কের মুখে ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিরা: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা জারি

গিগকর্মীদের বাইরেও বাংলাদেশে কর্পোরেট জগতের বিশাল এক স্থায়ী কর্মবাহিনী রয়েছে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে। এরকম বিক্রয় প্রতিনিধিরা চাকুরির নিরাপত্তায় গিগকর্মীদের চেয়ে খানিক এগিয়ে হলেও তুমুল মানসিক ও সামাজিক চাপের মাঝে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে। এর মাঝে সম্প্রতি এরকম প্রতিনিধিদের ঘিরে নানান সরকারি বিধিনিষেধ তাদের বিশেষভাবে মুশকিলে ফেলছে। আবার কোম্পানির চাপে এবং আগ্রাসী মার্কেটিং নীতির কারণে বিক্রিয়প্রতিনিধিদের অনেক অনৈতিক সামাজিক কাজেও যুক্ত হতে হচ্ছে।

বর্তমান বাজারে বিক্রয় প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছেন ওষুধ শিল্প খাতে। অনেকের কাছে তাঁরা মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভ নামেও পরিচিত। এদের সংখ্যা কত হবে তার কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। কয়েক লাখ বলে অনুমান করা হয়। বড় অংশ তাঁরা বিজ্ঞানে স্নাতক। চাকুরির দুষ্পাপ্যতার যুগে ওষুধ শিল্প বিজ্ঞানে স্নাতকদের জন্য প্রকৃতই বড় এক ভরসা। কিন্তু পণ্য বেচার প্রতিযোগিতায় এরকম বিক্রয় প্রতিনিধিদের সামাজিক ইমেজকে সংকটে ফেলেছে। বিশেষ করে প্রতিটি হাসপাতালে চিকিৎসকদের ঘিরে এরকম প্রতিনিধিদের জাল বিস্তার অযথাই প্রেসক্রিপশনে ওষুধের তালিকা বাড়িয়ে দিচ্ছে। হাসপাতালগুলোর পরিবেশও বিক্রয়প্রতিনিধি দলের কারণে মাছের বাজারের মতো হয়ে থাকছে। বিক্রয় প্রতিনিধিদের ক্রমাগত উপস্থিতি চিকিৎসক প্রয়োজনীয় সময়ের অনেকখানি কেড়ে নিচ্ছে। প্রতিটি হাসপাতালের ভেতরে-বাইরে সকাল সন্ধ্যা জটলা করতে দেখা যায় তাঁদের।

চিকিৎসকদের ওষুধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও প্রভাবিত করছেন বিক্রয় প্রতিনিধিরা। এসব বিবেচনা থেকেই সম্প্রতি সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি দশ দফা যে নির্দেশনা দিয়েছে তাতে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নির্দেশ সরকারি বেসরকারি উভয় ধরনের হাসপাতালে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়।

এই নির্দেশনায় হাসপাতালের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ভিজিটর কার্ড চালু করতে বলা হয়েছে। ভিজিটর কার্ডবিহীন কোনো দর্শনার্থী হাসপাতালের ভেতরে বা রোগীর কক্ষে প্রবেশ বা অবস্থান করতে পারবেন না বলে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই নির্দেশের আগে সবচেয়ে অসহনীয় অবস্থা হতো রোগীরা যখন চিকিৎসকের রুম থেকে বের হতেন। চিকিৎসকের সঙ্গে দেখার পর চেম্বার থেকে বের হওয়া মাত্র ওষুধ কোম্পানির উপস্থিত প্রতিনিধিরা রোগীকে যেভাবে ঘিরে ধরেন এবং প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলতে শুরু করেন সেটা কোন সভ্য দেশে দেখা যায় না। ছবি তোলার জন্য কোনো অনুমতি না নিয়েই হাত থেকে টান দিয়ে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ছবি তোলা শুরু করেন তাঁরা। কোম্পানির চাপে ও প্রয়োজনে চাকুরি বাঁচাতেই কর্মীরা এটা করলেও তা সমাজে অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়ে চলেছে। তবে অনৈতিক এই চর্চা অনেক চিকিৎসকও করেন। কোথাও চিকিৎসক নিজের প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলে সেটা নির্দিষ্ট কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিদের কাছে পাঠান তাঁর সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখার

জন্য। অনেক চিকিৎসককেই কোম্পানিগুলো রোগীর কাছে তাদের ওষুধ সুপারিশ করার বিনিময়ে নানান উপহার দিয়ে থাকে।

বহু চিকিৎসক ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক প্রতারিত হয়ে অনেক সময় সুস্থ মানুষকে রোগী বানিয়ে ওষুধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। আবার অনেক সুস্থ সবল মানুষ ওষুধ কোম্পানির প্ররোচনায় পড়ে আরো বেশি সুস্থ, সবল ও সুন্দর জীবনের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ওষুধ গ্রহণ করে। এসব ওষুধকে বলা হয় লাইফস্টাইল ড্রাগ। ফুড সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন, টনিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, স্থূলতা কমানোর ওষুধ, যৌন অক্ষমতা, মাথার টাক, মন চাঙ্গা করার ওষুধ–এসব ঐরকম ড্রাগের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক স্বাস্থ্য অধিকারকর্মী প্রায়ই বলেন, চিকিৎসকরা ওষুধ কোম্পানির সুবিধা নেয়া বাদ দিলে বা কোম্পানি সেসব দেয়া বন্ধ করে ওষুধের দাম অন্তত ২০-৩০ ভাগ কমাতে পারে। খুব রক্ষণশীল হিসাবেও বছরে কয়েক শত কোটি টাকার উপহার বা কমিশন নেন চিকিৎসকরা ওষুধ কোম্পানিগুলো থেকে। বলা বাহুল্য, এই অনৈতিক অবস্থার মাঝেই বিক্রয় প্রতিনিধিদের পেশাজীবনকে রাখা হয়েছে। আবার অনৈতিক এই পরিবেশে অতীতে সুনামের অধিকারী বিদেশী অনেক কোম্পানি এখানকার বাজার থেকে নিজেদের ঘুটিয়ে নিয়েছে। এর বড় কারণ চিকিৎসকরা বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে অনৈতিক চুক্তির কারণে গুণগতভাবে উন্নত ওষুধ কিনতে না বলে উপহার পাওয়া কোম্পানির একই ধরনের অনুন্নত ওষুধের নাম প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন।

ওষুধ কোম্পানিগুলোর এধরনের অনৈতিক ওষুধ বিপণন (Drug promotion) বহুকাল ধরে জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই অনৈতিক বিপণনে চিকিৎসকদের পাশাপাশি সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে থাকেন ওষুধ বিক্রেতা ও বিক্রয় প্রতিনিধিরা। বিক্রি বাড়ানোর এরকম চাপ প্রতিদিনই তাদের মানসিক চাপে রাখে এবং অসৎ চিন্তার মধ্যে রাখে। অনেক সময় বছরের শুরুতে তাদের নির্দিষ্ট একটা এলাকায় ওষুধ বিক্রির একটা বিশাল টার্গেট ধরিয়ে দেয়া হয়। মুশকিল হলো, ঐ একই এলাকায় প্রায় সব কোম্পানি তাদের প্রতিনিধিদের এভাবে অতিরিক্ত টার্গেট ধরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে উক্ত এলাকার ডাক্তারদের উপহারের পরিমাণই কেবল বাড়ে এবং পাশাপাশি জনগণকে অপ্রয়োজনে বেশি ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হয়। অনেক সময় এভাবে মানহীন অনেক ওষুধেরও ভোক্তা হতে হয় হতভাগ্য রোগীদের।

এ অবস্থার উল্টোদিকের আরেক চিত্র হলো ওষুধ কোম্পানির এই পেশাজীবীরা পেশাগত অধিকারের ক্ষেত্রেও সংকটে আছেন। তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ধর্না দিতে দিতে ডাক্তারদের পাশাপাশি ওষুধের দোকানদাররা তাদের অমর্যাদা করেন অনেক সময়।

বাংলাদেশ বিক্রয় প্রতিনিধি জোট নামের একটা সংগঠন এই পেশাজীবীদের প্রয়োজনে গত বছর কিছু দাবিনামা উত্থাপন করেছে জাতীয়ভাবে। এর মাঝে রয়েছে সব বিক্রয় প্রতিনিধির চাকরি স্থায়ী করা; বিক্রয় প্রতিনিধিদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা; কোনো বিক্রয় প্রতিনিধিকে চাকরিচ্যুত করলে তিন মাসের বেতন দেওয়া; কর্মরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া; প্রতি ঈদে বেতনের সমপরিমাণ বোনাস দেওয়া; সরকারি সব ছুটিতে বিক্রয় প্রতিনিধিদের ছুটি দেওয়া; এবং সব বিক্রয় প্রতিনিধিদের বেতন বছরে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা।

এর বাইরেও এই পেশাজীবীদের আরও কিছু চাওয়া আছে। এর মাঝে প্রধান এক বিষয় হলো এই পেশাজীবীরা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিবেচ্য হবেন সেটা তাঁরা জানেন না।

চামড়া খাতের ২০২৪

বাজার খারাপ; রফতানি কম; প্রণোদনাও কমলো; শ্রমিকদের মজুরিও বাড়েনি

বিশ্বে এরকম 'বাজার' বিরল যেখানে ক্রেতা পণ্যের দাম ঠিক করেন। বাংলাদেশে চামড়া খাতে তাই হলো ২০২৪ সালের কোরবানির ঈদের পর।

ঈদে প্রায় এক কোটি গরু, ছাগল, ভেড়া জবাই করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়। ঈদের আগে আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বসে গরু-ছাগলের চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দেন বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। মূলত এই সমিতির সদস্যরাই চামড়ার ব্যবহারকারী।

উল্লেখ্য, আগে ঈদ এলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ই চামড়ার দাম নির্ধারণ করতো। ২০২৪ সালে যে ব্যতিক্রম হলো এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম বলেন, 'চামড়া যেহেতু ট্যানারির মালিকেরা কেনেন, সেহেতু এবার দাম ঘোষণা করবেন অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। তাঁরা একটা ন্যূনতম মূল্য নিশ্চিত করে দিক, সেটাই আমাদের পরামর্শ।'

এই 'পরামর্শ' অনুযায়ী ২০২৪ সালে চামড়ার দাম ঘোষিত হয়। তবে ক্রেতারা সেই দামও পাননি অনেক জায়গায়। বিশেষ করে ছাগলের চামড়া ১০-২০ টাকায় বেচাবিক্রি হয়েছে বলে পত্রিকাগুলো লিখেছে। কোথাও কোথাও ছাগলের চামড়া এমনি এমনি রেখে আসতে হয়েছে সংগ্রাহকদের কাছে।

১৮ জুন ঈদের পর প্রথম আলো লিখেছে, 'কোরবানি হওয়া গরুর কাঁচা চামড়ার দাম প্রতিটি গতবারের তুলনায় ঢাকায় ৫০ থেকে ১০০ টাকা বেড়েছিল এবার। তারপরও নির্ধারিত দরের চেয়ে ২৭৫-৩০০ টাকা কমে বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে ছাগলের চামড়া কিনতে অনীহা দেখিয়েছে আড়তদারেরা। একেকটি ছাগলের চামড়া বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ১০ টাকায়।'

বলাবাহুল্য, এই অবস্থার প্রধান সুবিধাভোগী ছিল বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ)সহ এই খাতের নানান পর্যায়ের শিল্প। ঈদের দিনই সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে প্রায় ৪০ হাজার পিস কাঁচা চামড়া ঢুকেছে বলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা ১৭ জুন প্রতিবেদনে প্রকাশ করে। অন্যদিকে, ২০ জুন বণিকবার্তা লিখেছে, লবণযুক্ত ছাগলের চামড়ার দাম সরকার এবার গত বছরের চেয়ে ২ টাকা বাড়িয়ে প্রতি বর্গফুট ২০-২৫ টাকা নির্ধারণ করে দেয়। একটি ছাগলের যদি ৫-৬ বর্গফুট চামড়া হয়, লবণ দেয়ার পর সেটির দাম পাওয়ার কথা ১০০-১৫০ টাকা। যদিও এবার পশুটির চামড়া বিক্রি করে মিলেছে কেবল ১০ টাকা। কেউ কেউ আবার আশানুরূপ দাম না পেয়ে বিনা পয়সায় তা রেখে যান। কোরবানির গরুর চামড়াও আকার ভেদে বিক্রি হয়েছে ২০০-৯০০ টাকা পর্যন্ত। ঢাকায় কাঁচা চামড়ার প্রধান বাজার পুরান ঢাকার পোস্তায় ক্রেতা- বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। চামড়ার দাম কম হওয়ার পেছনে বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিএইচএসএমএ) সাধারণ উত্তর হলো শ্রমিক খরচ এখন অনেক বেড়ে গেছে। অর্থাৎ শ্রমিকদের

বাড়তি মজুরিকে সমন্বয় করা হচ্ছে চামড়ার দাম কমিয়ে।

প্রশ্ন হলো, এরকম সুবিধাজনক বাজারেও চামড়া খাত ভালো করছে না কেন? সরকার এই খাতকে অনেক ধরনের সুবিধা দেয়ার পরও কেন শ্রমিক মজুরিও বাড়ছে না, কাঁচামাল সরবরাহও অলাভজনক হয়ে পড়ছে? সরকারের দিক থেকে একটা বড় সহায়তা হলো চামড়া কেনার জন্য ঋণও দেয়া হয়। আবার রফতানি পণ্যেও প্রণোদনা দেয়া হয়। এসবের কিছুরই সুবিধা এখাতের শ্রমিকরা পাচ্ছে না। এমনকি এসব সুবিধা নিয়ে চামড়া খাতের বণিক সমিতিগুলো বহির্বিশ্বে তেমন বাজারও তৈরি করতে পারেনি। ২০২৪ সালেও পুরানো এই বাস্তবতার তেমন হেরফের হয়নি।

চামড়া খাতের পরিবেশগত সংকট চলছেই

চামড়ার দাম কম থাকার ব্যাপারে ট্যানারি মালিকদের দাবি, ঢাকার সাভারের চামড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার বা সিইটিপি এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। কঠিন বর্জ্য ফেলার জন্য স্থায়ী ভাগাড় বা ডাম্পিং ইয়ার্ডও গড়ে ওঠেনি। তাতে পরিবেশ দূষণ রয়ে গেছে। ফলে ট্যানারিগুলো বড় সংখ্যায় লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ পাচ্ছে না। এ সনদ না থাকায় চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রকৃত দর থেকে বঞ্চিত বাংলাদেশ। ফলে কাজে লাগানো যাচ্ছে না দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ রপ্তানি খাতের প্রকৃত সম্ভাবনা। তাছাড়া বিকল্প পণ্যের কারণে সারাবিশ্বে চামড়ার চাহিদা এবং দাম কমছে। এটিও রপ্তানি কমার একটি কারণ বলে দাবি করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এলডব্লিউজি বা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ সনদ হলো চামড়াজাত পণ্য রফতানি বাড়ানোর এক ধরনের সদর দরজা। অন্যভাবে বললে, লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ বা এলডব্লিউজি হলো চামড়া খাতের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলোর কাছে ভালো দামে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিক্রি করতে হলে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ থাকতে হয়। বিশ্বব্যাপী পরিবেশগতভাবে চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে বিষয়টি তদারকি করে এলডব্লিউজি।

বাংলাদেশে হাতে গোনা যে অল্প কয়টি প্রতিষ্ঠানের এই সনদ আছে তারা হলো অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার, এবিসি লেদার, রিফ লেদার, এসএএফ ইন্ডাস্ট্রিজ, সুপারএক্স লেদার ও সাইমন ট্যানিং ইনকরপোরেটেড। এত অল্প প্রতিষ্ঠানের এলডব্লিউজি সনদ থাকার একটা বার্তা হলো এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে এই খাতের কাজ-কারবার পরিবেশ-বান্ধব নয়। অথচ অনেক দেশ এ বিষয়ে অনেক এগিয়েছে। ভারতে ১৩৯টি, চীনে ১০৩টি, ইতালিতে ৬৮টি, ব্রাজিলে ৬০টি, তাইওয়ানে ২৪টি, স্পেনে ১৭টি, দক্ষিণ কোরিয়া ও তুরস্কে ১৬টি এবং ভিয়েতনামে ১৪টি ট্যানারির এ সনদ আছে। কেন এতদিনেও বাংলাদেশে এত কম প্রতিষ্ঠানের এরকম একটা দরকারি সনদ হলো না সেটা নিশ্চিতভাবেই বড় এক প্রশ্ন হয়ে আছে। বিশেষ করে এত টাকা খরচ করে চামড়া শিল্পনগরী করার পরও।

উল্লেখ্য, চামড়া খাতে পরিবেশ দূষণরোধ, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা ও রপ্তানি বাড়াতে ২০০৩ সালে সাভারের হেমায়েতপুরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। আধুনিক এ ট্যানারি শিল্প প্রকল্পটিতে ব্যয় হয় ১ হাজার ৭৯ কোটি টাকা। এর পর ২০১৭ সালে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারিগুলোকে সাভারের ঐখাতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে জায়গা বরাদ্দ পাওয়া ১৬২টি ট্যানারির মধ্যে বর্তমানে উৎপাদনে আছে ১৪০টি। কিন্তু বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হলেও হেমায়েতপুরে এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি সিইটিপি। স্থায়ী ব্যবস্থা হয়নি কঠিন বর্জ্য ফেলার জায়গা বা ডাম্পিং ইয়ার্ডের। ফলে আশেপাশের এলাকা তীব্রভাবে দূষণের শিকার বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ আছে।

চামড়া খাতের ব্যবসায়ের অবস্থা উৎসাহব্যাঞ্জক নয়

বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, সদ্য বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৯৬ কোটি ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১১২ কোটি ডলার।

বছর বছর পশু কোরবানির সংখ্যা বাড়লেও এবং কাঁচা চামড়ার দাম কম থাকলেও চামড়া রপ্তানি প্রত্যাশিতভাবে বাড়ছে না। যেসব কারণে চামড়া পণ্যের কদর কম তার একটা কারণ অবশ্যই সিইটিপি। তবে এ খাতের জন্য চলতি বছরে একটা বড় খবর ছিল সরকার চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করেছে। ফিনিশড লেদারে প্রণোদনা ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশ করা হয়। তবে ক্রাস্ট লেদার রপ্তানিতে ৬ শতাংশ প্রণোদনা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়। পণ্য রফতানিতে ভর্তুকি কমাতে আইএমএফের নির্দেশনার কারণে সরকার প্রণোদনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছিলো।

শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা

চামড়া খাতে শ্রমিকদের অবস্থা ২০২৪ সালে পূর্ববর্তী বছরের চেয়েও খারাপ ছিল। একদিকে প্রকৃত মজুরি না বাড়া, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে তারা দুর্দশায় পড়ে। এই খাতে সর্বশেষ মজুরি নির্ধারিত হয় ২০১৮ সালে। অর্থাৎ ছয় বছর আগের মজুরি কাঠামোতে শ্রমিকরা মজুরি পাচ্ছিলেন।

এই খাতে ২০১১ সালে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা

করা হয়েছিল আট হাজার ৭৫০ টাকা। আর ২০১৮ সালের মজুরি কাঠামোতে শহর অঞ্চলের শ্রমিকদের ১৩ হাজার ৫০০ টাকা ও গ্রামীণ জনপদের জন্য ১২ হাজার ৮৫০ টাকায় মজুরি উন্নীত করা হয়। সেটাও অনেক কারখানায় ঠিক মতো বাস্তবায়িত হয়নি। এর মাঝেই ট্যানারি খাতে ন্যূনতম মজুরি পুনর্বিন্যাস করতে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে নতুন করে মজুরি বোর্ড গঠন করে সরকার। এই বোর্ডের কাছে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ন্যুনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে। আর মালিকপক্ষ ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা বেতন নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে।

এর মাঝে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এ বছর এই খাতের মজুরি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক জাতীয় সেমিনার করে। সেখানে এই গবেষণা সংস্থা চামড়া শ্রমিকদের জন্য মজুরি ন্যূনতম ২২ হাজার ৭৭৬ টাকা করার প্রস্তাব করে।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাবনায় সিপিডি বলছে, চার থেকে ছয় সদস্যের পরিবারের শ্রমিকদের খাদ্য ব্যয় ২০ হাজার ৫৬৪ টাকা ও খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় ১২ হাজার ৮৮১ টাকা। সব মিলিয়ে মাসে গড়ে খরচ হয় ৩৩ হাজার ৪৪৫ টাকা। কিন্তু তারপরও খরচের চেয়ে ন্যূনতম মজুরি কম ধরার কারণ শ্রমিক পরিবারের কারো কারো কিছু আয় আছে। অনেক পরিবারের হাঁস, মুরগি, গরু পালন ও কৃষি খাত থেকে কিছু আয় আসে। এসব বিবেচনায় ২২ হাজার ৭ শত টাকা ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সেমিনারে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় ন্যূনতম মজুরির এই প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব নয়। গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ায় পণ্য উৎপাদন খরচে বেড়েছে। রাসায়নিকের দাম বেড়েছে ডলার সংকটের কারণে। অর্থাৎ মালিকরা উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয় বৃদ্ধিকে শ্রমিকের জীবন দিয়ে সহনীয় রাখতে ইচ্ছুক।

শ্রমিকদের চাওয়া মাসে ২৫ হাজার টাকা মজুরি

২০২৪-এ মজুরি বিতর্ক চলাকালে চামড়া খাতের শ্রমিক ইউনিয়ন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এক গবেষণা শেষে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা প্রয়োজন বলে দাবি করেছে। ২৯ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই গবেষণাভিত্তিক দাবি তুলে ধরে ইউনিয়ন। ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন দাবি করেছে, তারা ২০ জন নারী এবং ৩২ জন পুরুষ শ্রমিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা না হলে ট্যানারি শিল্পের একজন শ্রমিক বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা মেটানো থেকে বঞ্চিত হবেন।

শ্রম আইন ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ চাইছেন গিগকর্মীরা

২০২৪ ছিল গিগকর্মীদের জন্য এক মুশকিলের বছর। আবার কিছুটা ভালো বছরও বটে।

গিগকর্মীদের ই-শ্রমিক বা ই-কর্মজীবী বা স্বাধীন ঠিকাদার যে নামেই ডাকা হোক এরকম অনেকের জীবনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকা নির্ভর। ফলে জুলাই-আগস্টের আন্দোলনকালে রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ থাকায় অনেক সময় তাঁরা মজুরি সংকটে পড়েছেন। অনেক আহত হন তাঁরা। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই শ্রমজীবীগোষ্ঠীর কাজ পাওয়ার পরিমাণও কমে যায় আগে-পরে। এমনকি গণঅভ্যুত্থানের পরও সেই অবস্থা বহাল থাকে। আবার একই কারণে গিগকর্মীদের শ্রম আইনের আওতায় সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আইনগত সংস্কারের বিষয়টিও জাতীয় মনযোগের বাইরে থেকে যায়। অনেক গিগকর্মী এ বছর নবগঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের অপেক্ষা করছিলেন এবং আশা করছেন নতুন এই কমিশন তাদের বিষয়ে কিছু বিধি-বিধানের সুপারিশ করবে।

তবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার শাসনামলে এবং গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও ডিজিটাল কর্মপরিবেশ নিয়ে অনেক কথা হলেও সাধারণভাবে এই যুগের কর্মী হিসেবে গিগ ওয়ার্কারদের বিষয়ে আলোচনা একদম কমই থেকে গেছে এই বছর। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর দেশজুড়ে 'তারুণ্য' ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলেও এবং গিগকর্মীদের বড় একাংশ একই সঙ্গে শিক্ষার্থী ও এরকম পেশাজীবী হওয়া সত্ত্বেও তাদের পেশাগত বিষয়ে কোন সুখবর ঘটেনি।

আবার এই বছরের একটা ইতিবাচক দিক হলো গণঅভ্যুত্থানের পর রাস্তায় শৃঙ্খলা বাহিনীর অনাচারের পুরানো সংস্কৃতি বেশ বদলিয়েছে। চাঁদাবাজি ও হয়রানি বেশ কম ছিল আগস্ট থেকে।

মজুরি/বিশাল এক কর্মীদল

গিগকর্মীদের প্রায় কারোই আয় নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ আয় নিয়ে তাঁদের অনিশ্চয়তা চিরস্থায়ী। এর মাঝে নিশ্চয়তা বাড়াতে অনেকে তাঁরা ক্রমাগত বেশি সময় কাজের চেষ্টা করতে থাকেন। দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে দৌড়াতে যেয়ে তাঁদের জীবনের বিশ্রামের অংশটুকু ক্রমে কমতে থাকে। ঢাকায় দেখা যায় অনেকেই ছাত্র এবং একাধিক ধাঁচের গিগকর্মী। অর্থাৎ দিনের কিছু সময় সময় পড়ছেন, কিছু সময় হয়তো রাইড শেয়ারিং করছেন, আবার বাকি সময়ে হয়তো সন্ধ্যার পর কোথাও কাজ করছেন। এরকম বিবিধ কাজ করতে যেয়ে অনেক তরুণ কিস্তিতে মটর সাইকেল কিনে থাকেন। এই কিস্তির টাকা পরিশোধও তখন আর্থিক চাপের তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়। আবার এভাবে জীবন চালাতে চালাতে বয়স বাড়ার পর প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরির সুযোগ হারিয়ে ফেলেন অনেকে। তাছাড়া ২০২৪ সালের শুরুতে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ব্যাংক ও শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র দুর্নীতির যেসব খবরাখবর প্রকাশিত হয় তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক গিগকর্মীর জীবনই স্থায়ী হতে অনেকের। একজন গিগকর্মীর ভাষায়, 'টাকার প্রয়োজন আগে। তাই ঠিকমতো ক্লাস করতে পারি না। শুধু পরীক্ষা দিই।'

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) হিসাব মতে ঢাকায় এখন মোটরবাইক চালকের সংখ্যা প্রায় ৪৩ লাখ। এদের একাংশ গিগকর্মী। ফলে দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিরাট এক কর্মী বাহিনী গিগ শ্রমজীবীরা।

কোন বিশেষ ঘটনা: সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়া

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতোই ২০২৪ সালে গিগকর্মীদের জন্য স্থায়ী এক আতঙ্ক ছিল সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়া। প্রতিবছর দুর্ঘটনার হার ১০ ভাগ করে বাড়ছে। সকল ধরনের দুর্ঘটনায় আবার মোটরবাইক দুর্ঘটনার হারই বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিআরটিএ দুর্ঘটনার যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তাতে দেখা গেছে, মাসে প্রায় ৪-৫ শত দুর্ঘটনা নথিবদ্ধ হচ্ছে। এর মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ মোটরবাইক দুর্ঘটনা। প্রতিটি দুর্ঘটনায় গড়ে অন্তত একজন মানুষ মারা যাচ্ছে। ২০২৩ সালে সারা দেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছে ২ হাজার ৫৩২টি। এসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ২ হাজার ৪৮৭ জন এবং আহত ১ হাজার ৯৪৩ জন। নিহতদের মধ্যে ১ হাজার ৯০৯ জন, অর্থাৎ ৭৫ দশমিক ৩৯ শতাংশেরই বয়স ১৪ থেকে ৪৫ বছর মধ্যে। দুর্যোগ ফোরাম এবং রোড সেফটি ফাউন্ডেশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি-অক্টোবর পর্যন্ত ১ হাজার ৬৪৩টি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে এবং ১ হাজার ৩৬৯ জন মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যায়। (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের মাসিক প্রতিবেদন)

এরকম একটা ঝুঁকিভরা পরিবেশে নিত্যদিন কাজের মাঝেই অনেক গিগকর্মীরই অ্যাপভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বীমা সংক্রান্ত কোন চুক্তি নেই।

আমাদের অর্থনীতি ২০২৪-এর ২৫ জুলাই লিখেছে: বাংলাদেশে ডেলিভারি রাইডারদের ৪০ শতাংশের বেশি কাজ করার সময় আহত হয়েছেন, অথচ দুর্ঘটনা বীমা কভারেজের সুযোগ ছিল না তাঁদের। এঁদের জীবন এত প্রাত্যহিক সংকটগ্রস্ত যে, বড় বড় শহরগুলোতে বিশ্রাম বা টয়লেট সুবিধার কোন শোভন ব্যবস্থাও নেই তাঁদের জন্য। অথচ নগরজীবনকে চালু রাখছেন তাঁরাই।

এটা যেমন স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়াচ্ছে তেমনি শব্দ দূষণ ও বায়ুদূষণে প্রায় অধিকাংশ গিগকর্মী আক্রান্ত। একজন কর্মীর ভাষায়: 'সারাদিন বাইরে থাকতে হয়, বাতাসের মান খুব খারাপ থাকে। আর চারদিকে চলতে তাকে শব্দ দূষণ। আছে শীত ও গ্রীষ্মের সমস্যা। সকল কারণেই শরীর খারাপ হয়।

আইনগত সংস্কার

গিগবাহিনীর সংকটের একটা দিক হলো আইনগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কোন সুরক্ষা না থাকা। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অ্যাপভিত্তিক কাজ করতে যেয়েও অনেকে মুশকিলে পড়েন।

২০২৪ এর ১০ নভেম্বর ডেইলি স্টার বাংলায় এই পত্রিকার প্রতিনিধিকে রাইড শেয়ারিংরত একজন গিগকর্মী বলছিলেন: 'অ্যাপের মাধ্যমে কাজ করলে সাবস্ক্রিপশনের টাকা দিতে হয়। আয় না করলে ঝামেলা। দিন শেষে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় হয়। অ্যাপভিত্তিক সেবায় ভাড়া কম। তাই চুক্তি যাত্রী নিতে চায় সবাই।' এরকম ভাবনা থেকেই গিগ চালকদের অনেকে পাঠাও ও উবারের মতো প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে নিজেরাই দরকষাকষি করে মোটারবাইকে যাত্রী নেন। তবে আবার যাত্রীরা চান অ্যাপের সুরক্ষা। এই দ্বিমুখী অবস্থায় গিগকর্মী ও অ্যাপভিত্তিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সম্পর্কের আইনগত একটা কাঠামো গড়া এখন সময়ের দাবি। বিশেষ করে দেশজুড়ে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার মাঝে যেহেতু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ডিজিটাল কাজের দুনিয়া লাখ লাখ তরুণের নিয়তি হয়ে উঠেছে সে কারণে অ্যাপভিত্তিক কাজের জগতও এখন দেশীয় শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া দরকার। এছাড়া গিগকর্মীদের বীমাসুবিধার আওতায় কীভাবে আনা যায় সেটাও এই সময়ে একটা বড় বিবেচনা হওয়া উচিত।

২০২৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর সময় টিভির এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে: মাইক্রোবাস, সিএনজি অটোরিকশা, মটোরসাইকেলসহ অন্তত দেড় লাখ পরিবহন অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে উবার ও পাঠাওতে সংযুক্ত রয়েছে দেশে। এরা মূলত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং খাবার ডেলিভারি করে। কোম্পানি পরিবহন ব্যাবসায়ীদের আয়ের ওপর ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশন অ্যাডভান্স প্লাটফর্ম ফি, সার্ভিস চার্জ, বুকিং ফি, ট্যাক্স ইত্যাদি হিসেবে নেয়। এই কর্তন নিয়ে গিগকর্মী-ব্যবসায়ীদের মাঝে বিতর্ক আছে, অসন্তোষ আছে। সরকার এসব ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়গুলোকে একটা নিয়মে এনে প্রচার চালাতে পারে।

অন্যদিকে, বেকারত্ব বাড়ার মাঝে গিগ কর্মজগতে প্রতিযোগিতাও ক্রমে বাড়ছে। ২০২৪ সালে প্রায় প্রত্যেক গিগকর্মী জানিয়েছেন তাঁদের সকলের কর্ম পরিসরে নতুন কর্মী বাড়ছে– যা কর্পোরেটদের মজুরি না বাড়িয়েও কর্মী পাওয়া সহজ রেখেছে। একই কারণে আয়ও বাড়ছে না এরকম কর্মীদলের। যেমন, রাইড শেয়ারিং করছেন এমন মোটরবাইক চালকদের বেলায় দেখা গেছে, ফুলটাইম চালকরা মাসে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা ও পার্টটাইমারা মাসে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করতে পারছেন মাত্র। যা রাজধানীসহ বড় বড় শহরে জীবনযাপনের খরচের বিপরীতে খুব বেশি নয়।

সুবিধার দিক

তবে গিগকর্মীদের সবকিছু যে হতাশায় মোড়ানো তা নয়। অনেকেই এরকম কাজের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারছেন। কেউ কেউ পরিবারকে রক্ষা করছেন। যাদের মধ্যে নারীও আছেন অনেকে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০২১ সালে একটা স্টাডিতে দেখেছে বাংলাদেশি গিগ শ্রমিকদের

৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী। তারা তাদের শিক্ষাকে আয়ের সঙ্গে পরিপূরক করে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে আগেই (আমাদের অর্থনীতি, ২৫ জুলাই ২০২৪)।

তার বাইরের বড় বিষয়: গিগ অর্থনীতি ব্যক্তির ক্ষমতায়ন করে। ভৌগলিক ও সময়ের সীমাবদ্ধতা দূর করে, এটি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যম ব্যক্তিকে কর্মবাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ব্র্যাকের একটি স্টাডিতে ৫৭ শতাংশ মহিলা গিগকর্মী আর্থিক স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।

কিন্তু মুশকিল হলো এরকম পথে সকল বেকারের নিশ্চয়ই কাজের সুযোগ হবে না। ২০২৪-এর মাঝামাঝি দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৪০ হাজার। এদের একাংশকে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সুযোগ করে দিতেই হবে। বাকিদের দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজের সুযোগ করে নিতে হলে বা প্রবাসে কাজের সুযোগ পেতে হলে সরকারকে শ্রম আইন ও শ্রম সুরক্ষার পরিসরে বহু ধরনের সংস্কার ও উদ্যোগ নিতে হবে। যার মধ্যে বিশেষভাবে থাকতে হবে স্বাস্থ্যসেবারও সুযোগ-সুবিধা।

বিশ্ব শোভন কর্মদিবস উপলক্ষে পাটগ্রামে পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

৭ অক্টোবর বিশ্ব শোভন কর্মদিবস উপলক্ষে গত ০৩ অক্টোবর সকাল ১১ টায় সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) এর উদ্যোগে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থল বন্দর এলাকার শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পাথর ভাঙা শ্রমিকদের মাঝে মাস্ক ও লিফলেট বিতরন করা হয়।

পাথর ভাঙা একটি ঝুঁকিপূর্ন কাজ এই কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বহু শ্রমিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। একসময় ভারত থেকে আমদানী করা কোয়ার্টজাইট পাথর ভাঙাতে গিয়ে বুড়িমারীতে কয়েক হাজার শ্রমিক পাথরের সিলিকা কনার কারনে মরনব্যাধি সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়। সঠিক সময়ে এই রোগ সম্পর্কে চিহ্নিত করতে না পারা কারনে বহু শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। মরনব্যাধি সিলিকোসিস শ্রম আইন অনুযায়ী একটি পেশাগত ব্যাধি। বিগত ২০১৫ থেকে এসআরএস পাথরভাঙা খাতের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। পেশাগত ব্যাধি সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিক এবং পাথরভাঙা শিল্পের সাথে জড়িত মালিকদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সচেতনতাবৃদ্ধি, হেলথ ক্যাম্প, মাস্ক বিতরণ,শীতকালীন উপকরন বিতরন সহ বিভিন্ন মতবিনিময় সভার আয়োজন করে আসছে।

নির্মাণ শ্রমিক

বাংলাদেশে যেসব খাতে প্রতি বছর অনেক শ্রমিক আহত-নিহত হন তার একটা নির্মাণ খাত। সংখ্যায়ও এ খাতে কর্মী বিপুল। জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের কর্মীদের অনেক অবদান। গত কয়েক দশক ধরে নির্মাণ খাত বাংলাদেশে সবচেয়ে বিকাশমান খাতও বটে।

কিন্তু বিগত অন্যান্য বছরের মতো ২০২৪ সালেও এই খাতের কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় ভিত্তিক তেমন কোন অগ্রগতি ঘটেনি। এমনকি বহুল আলোচিত সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাতেও আর্থিক কারণে যুক্ত হতে পারছে না এই খাতের সাধারণ কর্মীরা। বছরের শুরুতে যে বারো দফা কর্মসূচিতে নির্মাণ শ্রমিকরা আন্দোলন করছিল বছরের শেষেও দেখা গেল সেসব অপূর্ণই থেকে গেছে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেইফটি এন্ড রাইটসের সংকলিত গত দশ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গড়ে প্রতি বছর নানান ধরনের দুর্ঘটনায় প্রায় এক শত জন নির্মাণ শ্রমিক মারা যায়। এই হিসাবে কেবল গত দুই দশকে, নির্মাণ খাতের উত্থানের সময়টায় প্রায় দুই হাজার শ্রমিক এ শিল্পে কাজ করতে যেয়ে মারা গেছে। এসব শ্রমিক তাদের ইউনিয়নের দাবি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণও পায় না।

জাতীয় বিল্ডিং কোডে কর্মকালীন একজন শ্রমিকের কী কী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে তার বিস্তারিত উল্লেখ থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। তাৎক্ষণিকভাবে এ অবস্থার শিকার হয় নির্মাণ খাতের কর্মীবাহিনী। ২০১৪ সালের জাতীয় ভবন নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী কাজের সময় শ্রমিকের মাথায় হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। যারা কংক্রিটের কাজে যুক্ত, নিয়ম হলো তাদের হাতে গ্লাভস পরতে হবে এবং চোখের জন্য ক্ষতিকর কাজের সময় চশমা পরা থাকতে হবে। ওয়েল্ডার ও গ্যাস কাটার ব্যবহারের সময় রক্ষামূলক সরঞ্জাম যেমন গ্লাভস, নিরাপত্তা বুট, অ্যাপ্রণ ব্যবহার করতে হবে। ভবনের ওপরে কাজ করার সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তা বেল্ট ব্যবহারও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে এর কোনোটিই বাস্তবে দেখা যায় না। কখনো শ্রমিকরা এসব সামগ্রী পাচ্ছেন না। আবার কখনো এগুলোর তদারককারী কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে ২০২৪ সালেও এসব ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি।

মৃত্যুর মিছিল থামছে না

সেইফটি এন্ড রাইটসের এক হিসাবে দেখা গেছে ২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে দেশের জাতীয় কাগজগুলোতে যেখানে ৩১৩০ জন শ্রমজীবীর কর্মস্থলে আসা-যাওয়া বা কাজ করার সময় মারা যাওয়ার খবর বেরিয়েছে সেখানে এককভাবে নির্মাণ খাতেই মারা গেছে ৬৬৪ জন। এরকম বাস্তবতাতেই নির্মাণ খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বাড়াতে সেইফটি এন্ড রাইটস ২০২৪ সালে একটা গবেষণা সম্পন্ন করেছে। সেখানে দেখা গেছে জরিপকালে ২৪ শতাংশ শ্রমিক তাদের হাত বা পা কাটার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন (সাধারণত এটাই সবচেয়ে বেশি ঘটে)। ভীতির পরবর্তী বিষয় ছিল উপর থেকে পড়ে যাওয়ার শঙ্কা, তড়িতাহত হওয়া, কাজের সময় পেশী বা রগে টান লাগার মতো বিষয়।

জরিপে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা কাজের জন্য পিপিই পাননি। অথচ নিয়োগকর্তারা নির্মাণ কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) প্রদান করতে বাধ্য। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের বিষয়ে, ৯১ শতাংশ বলেছেন, ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং তার শঙ্কা কমানোর

উপায় সম্পর্কে শ্রমিকরা কোনো প্রশিক্ষণ পান না। গবেষণায় এও দেখা গেছে, এখাতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের মতো সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বিরল।

নিরাপত্তা ছাড়াও মজুরির প্রশ্নও নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের একটা সমস্যাভরা বিষয়।

সাধারণভাবে, নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের মজুরি খুব কম– মাসের হিসাবে ১০ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। ডলারের হিসাবে যা ৯০ থেকে ১৮০ ডলার হবে। আলোচ্য জরিপকালে আনুষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায় এমন নির্মাণ কম্পানিগুলোতে শ্রমিকদের মাসিক গড় মজুরি ১৪ হাজার টাকা পেতে দেখা গেছে। আর, ব্যক্তি-নির্মাতাদের নিয়োগ করা শ্রমিকদের বেলায় গড় মজুরি দেখা গেছে মাসের হিসাবে ১৩ হাজার টাকা।

বাস্তবায়ন তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ না থাকায় সরকার ঘোষিত মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি তুলনায় নির্মাণ খাতে কর্মীরা কীভাবে কম পায় তার তুলনা হিসেবে একজন রাজমিস্ত্রীর উদাহরণ দেয়া যায়। জরিপে দেখা গেছে, রাজমিস্ত্রিরা গড় বেতন পান ১২ হাজার ৬২৭ টাকা। অথচ সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামোতে রাজমিস্ত্রিদের ন্যূনতম মজুরি ২৪ হাজার ৫৮০ টাকা। নির্মাণ খাত সংশ্লিষ্ট প্রায় সব কাজে শ্রমিকরা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির কেবল ৪৪ থেকে ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত পান বলে দেখা গেছে।

জরিপের পরও এ অবস্থার কোন রকমফের হয়নি উল্টো দ্রব্যমূল্য বেড়ে উপরোক্ত শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি অনেক কমে গেছে।

ইনসাবের ১২ দফা

বাংলাদেশে নির্মাণ খাতের একটা কেন্দ্রীয় সংগঠন হলো ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ বা ইনসাব। গত কয়েক বছর ধরে এই সংগঠন নির্মোক্ত বারো দফা দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম করছে:

১. সরকারি উদ্যোগে রাজধানী ঢাকা শহরে থানা ও ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং সারাদেশে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক নির্মাণ কলোনি স্থাপন করে সুলভ মূল্যে দীর্ঘমেয়াদি লিজ প্রদানের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। কলোনীতে শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল এবং চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ডসভা প্রতিমাসে একবার করতে হবে। তহবিল থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ব্যাপক কল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং সাহায্যের আবেদন ফরমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ যেভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. শ্রম আইনের আওতায় নির্মাণ শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। রেশনিং ব্যবস্থা, দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহত বা আজীবন পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আইএলও কনভেনশন ১২১ মোতাবেক Loss Of Earning Year (এক জীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ) এর ভিত্তিতে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে কোনোভাবেই যেন শ্রমিকদের ১৫ লাখ টাকার কম ক্ষতিপূরণ যাতে না দিতে পারে সে ব্যাপারে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।

৪. নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের অধিকার বাস্তবায়নে যাতে সহজে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে সে লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা/ উপজেলায় শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে এবং অধিকার ও পাওনাদির বিষয়ে ৪২ দিনের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৫. ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. শ্রম আইন সংশোধনী ২০০৬ এর ৩২৩ ধারা মোতাবেক জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য কাউন্সিলে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. কর্মস্থলে নির্মাণ শ্রমিকরা যাতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও সহিংসতার শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শুধু সার্ভিস চার্জ নিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে বিদেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ বন্ধ করতে হবে;

৯. সরকারি উদ্যোগে বিভাগীয় শহরে থানা ভিত্তিক এবং জেলা ও উপজেলায় শ্রম ছাউনি নির্মাণ করতে হবে। ছাউনি ছাড়া নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের সন্ধানে খোলা আকাশের নিচে বসতে হয়।

১০. নারী নির্মাণ শ্রমিকদের সমকাজে সমমজুরী নিশ্চিত করতে হবে।

১১. নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য রেজিস্ট্রার খাতা রাখার বিধান সকল নির্মাণাধীন ভবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২. নির্মাণ শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়িয়েও প্রবাসী শ্রমিকরা বাড়তি কোন সুবিধা পাচ্ছেন না

প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকরা এ বছর দেশের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের স্বার্থে। অর্থনীতিতে বৈদেশিক দেনার চাপ বাড়া মাত্র তাদের উপর জাতীয় ভরসা বাড়তে থাকে। প্রবাসীরাও সরকারকে বিমুখ করেননি। আন্দোলন সংগ্রামে ইন্টারনেট সংযোগ অনেক দিন বন্ধ রাখার পরও দেশজুড়ে ২০২৪ সালে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের নতুন রেকর্ড হয়েছে। পুরো বছরে দেশে এসেছে প্রায় ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪ সালের রেমিট্যান্স প্রবাহ আগের বছরের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে, এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৯ লাখ ৩০ হাজার কর্মী চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছেন। এর মাঝে ৮ লাখ ৫৮ হাজার ২২৫ জন ছিলেন পুরুষ এবং ৭১ হাজার ৭৭৮ জন নারী। আন্দোলনের কারণে জুলাই আগস্টে দেশে অবরোধ ও অস্থিরতা থাকায় বিদেশ যাওয়া কর্মীর সংখ্যা প্রত্যাশা অনুযায়ী না হলেও বছরের শেষ দিকে সেটা আবার বাড়তে শুরু করে। বছরের প্রথম ছয় মাসের প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে এখনও বিদেশ যাওয়ায় বাংলাদেশী কর্মীদের প্রধান পছন্দ সৌদি আরব। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মালয়েশিয়া। বছরের ছয় মাসে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার অভিবাসী কর্মী সৌদি আরব গেছেন। ৯৩ হাজার গেছেন মালয়েশিয়ায়।

তবে বিদেশ যাওয়া বাংলাদেশী কর্মীদের মাঝে এখনও অদক্ষদের সংখ্যাই বেশি। জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরোর মতে প্রবাসে যাওয়া বাংলাদেশী শ্রমিকের ১০ দশমিক ৪ শতাংশ মাত্র দক্ষ। এছাড়া নারীকর্মীদের প্রবাসে যাওয়ার হারেও বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে। পুরো কর্মীদলের দশ শতাংশও নয় সেটা।

বিদ্যমান নানান বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিদেশ যাওয়া বেশ ব্যয়বহুল এবং দুরূহ একটা কাজ হলেও জাতীয় বাজেট ও সরকারি নীতিনির্ধারণে এ বছরও প্রবাসীদের ব্যাপারে বড় কোন পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

বাজেটে রেমিট্যান্স প্রণোদনা পাঁচ শতাংশ ধারণা করা হলেও সেটা হয়নি। উল্লেখ্য, বৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করতে ও হুন্ডি ঠেকাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুই শতাংশ হারে প্রণোদনা দেওয়া শুরু করে সরকার। ২০২২ সালে এই প্রণোদনা বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করা হয়।' কিন্তু গত বছর সেটা আর বাড়েনি, যদিও বাড়ার অনুমান ছিল। এ বিষয়ে ৩০ জুন দৈনিক ইনকিলাবকে এক সাক্ষাৎকারে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে প্রস্তাবিত বাজেটে বড় উদ্যোগ না থাকা দুঃখজনক। প্রবাসী শ্রমিক মারা গেলে পরিবার তিন লাখ টাকা পেলেও তা সরকারি কোষাগার থেকে আসে না। দেশ ছাড়ার সময় একজন শ্রমিক যে কল্যাণ ফি দেন তা থেকেই পরিবারকে দেওয়া হয়। এছাড়া ফেরত আসা শ্রমিকরা

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকেও সহযোগিতা পান না। এই মানুষরা পরিবারের কাছে টাকার মেশিনের মতো, রাষ্ট্রের কাছে রিজার্ভ। আমরা যদি প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে আরও উদ্যোগ নিতে পারি এবং তাদের জন্য আরও ব্যবস্থা নিতে পারি তবে তারা বড় রিটার্ণ দেবে।

আগস্টে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বিমান বন্দরে একটা বিশেষ লাউঞ্জের উদ্বোধন করা হয়।

এই লাউঞ্জের উদ্বোধনকালে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমাদের অভিবাসী শ্রমিকরা দেশ গড়ার কারিগর। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে তারা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা তাদের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা বিশ্বাস করি এই লাউঞ্জ তাদের ভ্রমণকে সহজ করবে।

হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে এটি এই ধরনের প্রথম প্রবাসী লাউঞ্জ। এটি বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের বিশ্রামের জন্য কিছু জায়গা এবং রিফ্রেশমেন্টের জন্য ভর্তুকিযুক্ত খাবার সরবরাহ করবে। লাউঞ্জের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইন ও প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগের মাসে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য সৌদি আরব থেকেও একটা সুখবর আসে। দেশটি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিমা পরিষেবার নতুন উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। শ্রম অধিকার লঙ্ঘন ও ভিসা প্রতারণার কারণে প্রবাসী শ্রমিকরা প্রায়ই নিয়োগকর্তার থেকে প্রাপ্ত অধিকারের বিষয়ে বঞ্চনার শিকার হন। এ সমস্যা সমাধানে নতুন বিমা ব্যবস্থা চালু করেছে সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয়।

নতুন এ বিমা অনুযায়ী, কর্মীদের বেতনের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমার বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি বা নিয়োগকর্তা অর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলে শ্রমিকদের ছয় মাস পর্যন্ত বিমার আওতায় বেতন পরিশোধ করা হবে। এর জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ হবে ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল।

পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধির উপর নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে এসআরএস এর নতুন প্রকল্প "ফ্যাশন ফরওয়ার্ড: পোশাক শ্রমিকদের পক্ষে ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর"

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় COP চুক্তি অনুযায়ী, বিশ্বের দেশগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বলানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন কমাতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্বন নির্গমন কমাতে চুক্তিবদ্ধ এবং বাংলাদেশের পোশাক শিল্প (RMG) একটি বড় কার্বন নির্গমনকারী খাত হিসেবে বিবেচিত।

পোশাক শিল্পে নবায়নযোগ্য এবং পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করলে, যা কেবল কার্বন নির্গমন কমাবে না, বরং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করবে। উন্নয়ন সহযোগী অক্সফাম বাংলাদেশের সহযোগীতায় সেইফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যা শ্রমিকদের জ্বালানি রূপান্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

প্রকল্পটি ঢাকার পোশাক শিল্প অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে, এর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, জাতীয় জলবায়ু নীতি প্রণয়ন, এবং কর্মী-সমাজের জন্য জলবায়ু সহনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির রূপান্তর নিশ্চিত করবে, যা বৈশ্বিক পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করবে।

শ্রমজীবী মায়েদের সন্তানদের জন্য এসআরএস এর চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট সেন্টার

ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যানে হাজারো শ্রমজীবী নারীর বসবাস। বেশীরভাগ শ্রমজীবী নারীরা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। নারীদের জন্য পোশাকশিল্প একটি নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষেত্র হলেও তারা নানাভাবে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয় কারখানার মালিকপক্ষের দ্বারা। বিশেষ করে যে সকল নারী গর্ভবতী হন তাঁদেরকে বাধ্যতামুলকভাবে চাকুরিচ্যুত করা হয়। কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ সকল কারখানায় এমনকি কমিউনিটিতেও কোন প্রকার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা নেই। এই এলাকার পোশাক কারখানায় কর্মরত নারীদের বেশিরভাগই মালিকপক্ষ থেকে মাতৃত্বকালীন কোন সুযোগ সুবিধা পায়না এবং একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মী প্রসব-পরবর্তী সময়ের মধ্যে তাদের আয়ের একমাত্র উৎস হারানোর ভয়ে খুব দ্রুত কাজে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে নারী শ্রমিকরা হয় চাকরি ছেড়ে দেয় অথবা সন্তানদের পরিবারের বয়স্ক সদস্যের কাছে রেখে কাজে যায় আবার কিছু অভিভাবক তাদের ৩/৪ বছরের বাচ্চাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। ফলে এ সকল শিশুরা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মায়ের বুকের দুধ থেকে শুরু করে সকল ধরনের প্রাক-শৈশব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে বেশীরভাগ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে যা তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে বাঁধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, এ কমিউনিটির ৩/৪ বছর বয়সী শিশুদের একা একা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা খুবই স্বাভাবিক, কারণ অধিকাংশ পরিবারে তাদের যত্ন নেওয়ার মতো কেউ থাকে না। অপরদিকে, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী তাদের বাচ্চাদের লালন-পালন করতে গিয়ে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি পারিবারিক সহিংসতাও বৃদ্ধি পায়। একটি ভালো ও নিরাপদ স্থান বা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রই পারে এই সমস্যার সামাধান করতে। সেই লক্ষে এসআরএস তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা উদ্যান এলাকায় স্থাপন করেছে চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট সেন্টার । গত জুলাই'২০২৩ সালে মাত্র ৪ জন শিশু নিয়ে শুরু করা এই চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট সেন্টারে বর্তমানে ২৩ জন শিশু আছে। সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত শ্রমজীবী মায়েরা তাদের ছোট শিশুকে এই চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে রেখে যেতে পারেন। এসআরএস কর্মী এবং বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহায়তায় এই চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট সেন্টারটি পরিচালিত হচ্ছে। এসআরএস আশা করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ যদি তাদের সাধ্য মত সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে এই চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট সেন্টারের সুবিধার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

Editorial

Workers Entering the New Year with Concerns of Economic Recession

On behalf of Safety and Rights Society (SRS), we extend our heartfelt greetings for the new year. Recently, Bangladesh celebrated 54 years of independence, and SRS marked 15 years of its remarkable journey. Concurrently, Bangladesh entered 2025 after navigating through a mass uprising last year.

Five decades of a country's lifespan and a decade and a half for a non-governmental organization are not insignificant periods. Bangladesh emerged from extreme poverty and devastation, while SRS began the journey with a limited resource. The nation's need was poverty eradication and prosperity. Conversely, SRS's goal was to make a contribution to the prosperity of the country and support the working people in creating a just society.

No organization can move forward ignoring its surrounding realities. The socio-economic circumstances define the scope of work for a progressive organization. SRS is no exception.

Since independence, Bangladesh has witnessed a significant infrastructural development with a large affluent population boosting the products demand. Consequently, the labor sector has expanded, with 60 to 70 million people directly trading their time and effort. Simultaneously, it is evident that there is a minimum reform in the colonial state and legal frameworks. As a result, despite economic growth, the democratic ambiance of workers' employment has not yet become promising. The lifestyle of workers remained quite unsatisfactory. According to international standards, there was and still is a lot to be done regarding decent work environments. Despite poverty eradication being a national objective, workers' families have not yet received opportunities that would allow them to ensure stable exit from poverty. SRS has aimed to play a supportive role for both the government and the working populace. This remains our primary goal and will continue to be so in the future. We are fundamentally striving to improve the living standards of workers informal and informal sectors. Workers'

satisfaction will reinforce the roots of democracy. Political stability will become sustainable if the majority of the lower-income population experiences comfort in their lives.

Based on this consideration, we annually review the labor economy at the national level. By identifying the major events and trends in the labor sector from the past year, we aim to assist labor organizations and the government's policy-making. We have been carrying out this annual work for many years. This year, too, we are publishing a compilation on the labor dynamics of 2024. Naturally, this year's compilation has highlighted the participation of workers in the mass uprising of students and the public.

Although, compilation of information on workers' participation in the 2024 uprising is not available yet, we have presented key aspects to ensure that the ongoing structural reforms of the institutions or systems consider the expectations of the workers. There is an urgent need for comprehensive reform of labor laws, especially since many sectors, including domestic workers and gig workers, are not yet included in the labor laws. As new labor populations emerge alongside traditional sectors, progressive and forward-looking labor law reforms are now essential.

Moreover, the institutional methods and organizations responsible for determining workers' wage structures need to be updated. We believe that a permanent legal framework is necessary to align workers' wage structures with ever changing market systems. Labor organizations have long sought such solutions to avoid street protests and struggles.

The workers, like people from all professions, have numerous expectations from the post-uprising interim government. To meet the expectations, the government has already formed a labor commission. SRS is collaborating with this commission and has already submitted some specific recommendations; particularly, measures to enhance workers' social security benefits. We hope these recommendations will be prioritized by the commission. The success of the July-August anti-discrimination uprising in 2024 will largely depend on how much workers' lives become free from inequality.

However, the year was quite challenging for workers due to price hike of essentials and food inflation remained in double digits. The earnings of workers in the informal sector were repeatedly hindered during the uprising. From August, industrial areas began experiencing significant instability. Workers did not receive any payment as many industrialists and businessmen close to the fallen government either fled or were detained. Number of factories are shut down were on the verge of closing due to eruption of violence.

Overall, the post-uprising period became excruciating for workers. They hope that the labor commission's final report and its recommendations will be implemented, bringing relief to the industrial zones. However, towards the year's end, social investments from the government decreased, in line with IMF recommendations, leading to a contraction in the informal sector and reduced labor mobility. SRS received reports that job opportunities in villages were dwindling. The government also limited fair-priced goods sales arrangements. The signs of economic recession became quite evident in November- December. It is anticipated that 2025 will not be a favourable year for workers. Yet, we extend our best wishes for the new year to everyone. Unfortunately, there is no promising news for Bangladeshi workers at the moment, except hope.

Sekendar Ali Mina

Compulsory ETP and waste management needed for decent work environment

Bangladesh is an agricultural country. Its agriculture depends on rivers and water bodies. Nature has shaped the region accordingly. The rivers, canals, and beels across the country also provide a major source of protein. Together, the major step to ensure Bangladesh's food security is to keep water resources free of pollution.

Moreover, industrialization is also essential. In balancing these two needs, it is important to remember that all industries in the country must rely on waste treatment.

Under no circumstances should industrial activities be allowed to pollute water resources. Moreover, in today's world, markets for industries without proper waste management are increasingly shrinking. On the other hand, industries with waste management in place also ensure a decent working environment for labourers, which is extremely important in a labour-intensive and densely populated country. In other words, the path to Bangladesh's economic development lies in a proper balance between rivers, industrialisation, and a decent working environment.

But the opposite is happening. On 2 May 2024, Pinaki Roy wrote in the Voice of America's Bengali Service: Since Bangladesh's independence, 115 rivers have disappeared, and the remaining rivers are on the brink of death. Many rivers' waters are unbearable to look at, and approaching them is even more intolerable. Textile and other industrial wastes have turned the waters of these rivers into stinky and foul liquids. Existence of life is not possible in this water. Unfortunately, it's not just the rivers near Dhaka and Chattogram; even the rivers in remote districts are on the brink of death due to pollution. The oxygen level in these rivers is very low.

According to news reports, the main reason for the loss of rivers and water bodies is encroachment. However, the waste treatment systems of large and medium-sized industries in areas adjacent to rivers are another significant cause of water resource destruction in Bangladesh. In industrial zones, waste is directly dumped into nearby water bodies, rivers, and canals. The environment department does identify such factories, but they can do little to compel them to install Effluent Treatment Plants (ETPs). Without a firm and strong commitment from the government, this situation cannot be changed. Although the environment department imposes fines on various industries to raise awareness about ETPs, the results have been minimal.

On 4 January 2024, a report in the Daily Prothom Alo revealed that in just nine upazilas of Sirajganj district, there are 225 handloom factories along with nearly 300 dyeing factories. These factories generate an average of 1,000 liters of liquid waste daily, which is spread around without any treatment. Only a few factories, less than ten, have ETPs. The rest do not install waste treatment systems due to the high costs. As a result, the surrounding environment is suffering. They are not interested in investing in ETPs, and there is no strict monitoring or institutional pressure on them. This lack of waste management in various

industries is damaging Bangladesh's river resources, land, underground water, and particularly the decent work environment.

However, there is no alternative to decent work for sustainable development and investment. Bangladesh is facing an image crisis in terms of labour conditions, mainly due to deficiencies in industrial waste management.

Without ETPs, the direct consequences extend beyond water and land, posing serious risks to urban public health. Recently, Transparency International Bangladesh (TIB) reported that recyclable and reusable medical waste from various hospitals is being sold in the city through syndicates. TIB's investigation found that the contracted companies responsible for waste disposal are involved in the illegal trade of medical waste. Instead of disposing of the waste, these contractors sell it in the black market. One well-known contractor said medical waste sales are a significant source of income for such contractors' firms. This poses a significant risk to human health.

TIB also highlighted the challenges of waste management capacity. There is a shortage of designated coloured containers for waste disposal. According to the 2008 Medical Waste Management and Processing Rules, hospitals are required to have six specific coloured containers for waste disposal, but TIB's survey of hospitals found that 60 per cent of them did not have these containers. Waste was disposed of indiscriminately within hospitals, and in some cases, waste workers collected and stored all types of waste in a single bucket or container.

One of the industries facing significant image crisis due to lack of waste management and ETPs is the leather industry. Waste from leather factories in the Leather Industrial City at Savar near Dhaka could not be brought under ETP entirely.

As a result, this sector is unable to grow on an international scale. Leather and leather goods are Bangladesh's second-largest export commodity, and the target for exports in the 2023-24 fiscal year was set at $13 billion. However, the potential for this sector is even greater.

Labour organisers in this sector say, "The only reason the leather industry is not performing well is the lack of ETPs and compliance. Environmental issues must be prioritized. Due to the lack of compliance, investors are compelled to be satisfied with less than 30 per cent of the business potential."

It is noted that leather processing generates two types of waste: solid and liquid. In Savar and other areas with leather factories, the lack of proper treatment of both types of waste is causing significant anger among local communities. The waste from the leather industry is causing extensive river and air pollution.

It is worth mentioning that many factories in industrial zones have ETPs, but their owners do not use them, as reported regularly in the media outlets. Narayanganj district is particularly notorious in this regard. There are over 2,000 small and large industrial factories along both sides of the Shitalakkhya River, which are dumping untreated chemical waste directly into the river, causing severe pollution. The Shitalakkhya is connected to seven rivers. There are 26 canals and numerous ponds in the area. As a result, the pollution of the Shitalakkhya is severely damaging the agricultural and fishery resources in the district.

The environment department itself reports that out of more than 2,000 garment factories in the district, only 600 dyeing factories have ETPs, and not all of them are operational. Despite raids and fines imposed on factories for environmental pollution, cutting gas and power lines, many of these factories resume operations shortly.

A major example of how industries without ETPs are damaging agriculture and fishery resources is Gazipur district.

On 15 February 2024, local correspondent Masud Rana wrote: The tasty fish of open water bodies in Gazipur once met a significant portion of Dhaka's demand for protein. Small-scale fishermen who once relied on these waters for their livelihood are seeing fewer fish in the rivers and ponds. The surrounding farmlands are also experiencing reduced crop yields due to the pollution. The factories around the area are dumping untreated liquid toxic waste into the Turag River and surrounding canals. As a result, the surrounding water bodies and farmland are being destroyed. Despite several complaints from local residents, no action has been taken by the environment.

According to the district fisheries office, fish production in Gazipur's open water bodies was 20,361 metric tonnes 14 years ago. Now, this has decreased to just 1,953 metric tonnes.

In the Konabari area of the city, there are 10 dyeing and washing factories under the Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC). During a visit, it was found that black water was being released through a drain right in front of the factory gates.

Javed and Champa: Two sides of owner-worker disparity in Bangladesh

[This report was originally published under a different title in the English daily The Business Standard on 4 November 2024. The report, comparing the family of a garment factory owner in Bangladesh with the workers of the same factory, was widely discussed last year. Here, a portion of it is presented: Editor]

In 2023, Javed, the son of a business family in Bangladesh, hosted an extravagant wedding ceremony in Paris. At the same time, workers at their family-owned domestic factory were protesting over unpaid wages.

In September 2023, Javed married the Indian-origin fashion icon Rosemin Madhavji in a lavish ceremony in Paris. Pictures and videos of the event went viral on social media.

Javed's wedding was listed among the most expensive weddings in Paris in 2023. The event attracted attention from international media, with magazines like Vogue and Tatler covering it extensively.

While this display of wealth was unfolding, workers at the 'Generation Next' Fashions Limited, owned by Javed's family, were struggling with months of unpaid wages.

Starting from September 2024, these workers began protesting for their overdue pay. The protests eventually led to clashes with law enforcement, and on 9 September, the factory was temporarily shut down. Later, the decision was made to permanently close the factory. At that time, the workers were owed three months' wages.

The workers' protests continued at that time. On 23 October, Champa Khatun, a worker at Generation Next, was injured during a protest and passed away in the hospital six days later. This incident sparked renewed unrest in the industrial zone. While Generation Next was not the only company responsible for the unrest in the garment sector, it played a significant role in exacerbating the situation.

Following the unrest after the mass uprising, labour discontent began to subside by the third week of October. Most factories reopened, except

for a few, including Generation Next, which had not paid its workers' overdue wages.

It is believed that Javed, a former director of the company, and his father, the current chairman Touhidul Islam Chowdhury, are currently abroad.

Javed is also involved in several business ventures in Bangladesh, where he holds shares and post of director. He is the vice-chairman of AJ Corporation, chairman of Fu-Wang Ceramic Industries Limited and SS Steel, and a director at Generation Next Technologies Limited. His family's business spans industries such as apparel, real estate, and steel production. Since the fall of the Awami League government led by Sheikh Hasina on 5 August, Javed and his father are reported to have gone into hiding.

Javed's father's second wife, Saida Muna Tasneem (former Bangladesh ambassador to the UK), is believed to have facilitated a close relationship between the Sheikh family and Javed's family. According to the BGMEA, Saida Muna is also a shareholder in Generation Next.

Javed is the son of Touhidul's first wife.

Saida Muna Tasneem served as Bangladesh's high commissioner to the UK from November 2018 to September 2024. After the interim government ordered the return of diplomats appointed by the previous government, Saida Muna Tasneem did not comply.

Diplomats are usually appointed for a three-year term, but due to her close ties with the Sheikh family, Saida Muna served in the UK for nearly six years.

Meanwhile, officials of a garment factory owned by this family said that after the political instability in July and August, Generation Next began facing difficulties in paying wages to workers.

While the wages for general workers were paid in July, the management staff's wages were not paid.

In August, the wages of more than 4,700 workers and employees remained unpaid. As of the time of writing this report, the estimated outstanding wage amount owed to the workers by the company is Tk 216.6 million.

Though wages remained unpaid since August, workers continued to work in the factory. Initially, they voiced their concerns within the factory premises, but by September, they began to protest by halting work. On 8 September, they began a strike, which escalated on 21 September, with workers blocking roads. This led to clashes with law enforcement, resulting in Champa's death.

This story presents two realities—on one side, Javed's extravagant lifestyle, and on the other, Champa's silent demise.

Champa's background

Champa Khatun rented a small tin-roofed room with brick walls in the Diakhali Uttorpara area, where she lived with her husband and daughter. Several of her coworkers also rented houses nearby. Her husband's elder brother, Mostafizur Rahman, also lived in the same area. On 28 October 2024, he told Prothom Alo, "Everyone was asking for their fair demand, and that led to the protest. Champa joined the protest, and she died there. Champa was buried at her father's home in Rangpur. She has a 14-month-old daughter. How will the girl live without her mother?"

As previously mentioned, workers hurled bricks at nearby factories and police during the protest on 23 October. The police fired tear gas and sound grenades to control the situation. Champa was critically injured in the incident.

An eyewitness, Sharifa Khatun, who was standing near Champa at the time, said, "Champa and Morsheda were at the front of the protest. The police were very close. Suddenly, there was a loud noise. It sounded like a bomb, and fireballs fell right in front of us. At that moment, both Champa and Morsheda fell. I ran toward a house, and when I fell, four or five others fell on me. Later, Morsheda was taken to the hospital, and Champa was also rushed to the hospital."

Yes, Champa Khatun died at Dhaka Medical College Hospital. However, her death is neither the first nor the last in Bangladesh due to the exploitation of workers.

This issue of worker exploitation existed not only during the previous governments, the protests in various industries, particularly in the garment

sector seeking various demands including wages occurred after the mass uprising.

On 12 September, Prothom Alo reported that, during that period, labour unrest led to the temporary closure of 183 garment factories in Savar, Ashulia, and Gazipur, with workers demanding wage adjustments and raising 18 key demands. The government later reached an agreement with the workers.

Among the 18 points, there were also demands for providing rations through TCB and OMS in labour-intensive areas, monitoring to stop the blacklisting of workers in factories, identifying buyers from among the workers by monitoring the jute business, reviewing the cases filed against the workers and resolving those through the law ministry, addressing discrimination in hiring, providing compensation for those killed in the July movement, forming a committee for the Rana Plaza and Tazreen Fashion incidents, ensuring day-care centres in all factories, stopping the unjust dismissal of workers, increasing maternity leave for female workers to 120 days, forming a three-member committee to set the minimum wage, working on labour law amendments, reviewing and implementing provident funds through discussions between workers and employers, and forming a committee for annual increments based on the cost of living.

758 workers killed in workplace accidents across the country in one year

758 workers were killed in 639 accidents across the country in the last 1 year (January 1 - December 31, 2024). In the same period in 2023, 875 workers were killed in 772 workplace accidents across the country. This year the number of workplace deaths has decreased slightly since last year. Workers who died in road accidents on their way to work were also included in the survey

The data comes from a survey conducted by the non-governmental organization Safety and Rights Society (SRS) based on news published in newspapers (15 national and 11 local). December 31 at 11 a.m. in the SRS conference room, Executive Director Sekender Ali Mina officially presented the survey report 2024 of workers killed in workplace accidents.

Based on an analysis of workplace accident data obtained from the survey, the transport sector recorded the highest number of worker fatalities, totaling 379 individuals. Following closely are service establishments, including workshops, gas and electricity supply establishments, etc., with 129 reported fatalities. Construction ranks third, with 92 workers killed, and followed by 70 fatalities in factories and other productive establishments. The agriculture sector recorded 86 worker fatalities.

Upon reviewing the causes of death, it is evident that 464 individuals perished in road accidents, 81 succumbed to electrocution, 30 lost their lives in fires and various explosions, 50 met their demise by falling from a floor or above, 69 were struck by lightning, 21 were either hit or crushed by hard or heavy objects, 7 perished due to the collapse of mountains, ground, bridges, buildings, roofs, or walls, 11 were exposed to chemicals or toxic gases from septic tanks or water tanks, 17 drowned in water, and 8 passed away from other causes

Double-digit inflation: Workers' struggles; even the non-poor at risk of poverty

In 2024, food inflation in Bangladesh reached its highest point in nearly a decade. Inflation was rising at a double-digit rate across other products as well. Some media outlets reported that Bangladesh's inflation was among the highest in South Asia at that time.

Throughout the year, prices of goods were increasing at an average rate of over 10 per cent, forcing workers to significantly cut back on their daily consumption. During this period, wages for workers had not increased in most sectors. As a result, workers had to reduce their consumption, limiting their purchases to essential food items and foregoing other needs and luxuries.

The government increased its truck sales in urban areas and activated low-cost stores to alleviate the situation.

It should be noted that printing money without increasing goods and services causes inflation by reducing the value of money. In simple terms, a-10 per cent inflation means that if an item cost Tk 100 last year, it now costs Tk 110. For workers, this translates into an effective reduction of their real wages by 10 per cent. For instance, if a worker earned Tk 10,000 last year, their earnings are now equivalent to about Tk 9,000 in terms of purchasing power in 2024.

As a result of decreased real wages and reduced consumption, many working-class families entered the poverty line this year.

Inflation was further exacerbated by repeated money printing without increasing national wealth during the tenure of previous governments, and this continued through the end of 2024. Moreover, the excessive money printing policy counteracted other policies aimed at controlling inflation.

New open market sale (OMS) policy for food grains

In October, the government issued a new open market sale (OMS) policy for food grains, aimed at ensuring strict punishment for dealers violating regulations. The 2015 policy was also revoked, as it lacked any provisions for penalizing dealers for non-compliance.

The new policy states that if any conditions are violated or any laws of the country are disregarded, the dealership can be canceled, and money can be recovered from the dealer according to the terms of the agreement. If an OMS dealer fails to collect the allocated food grains on time without a valid reason, their dealership can be canceled, or their deposit can be forfeited.

Additionally, the government decided to include vegetables in the OMS, with responsibility for implementation handed over to the agriculture ministry. At the time, long queues were noticed

at the OMS shops. Initially, 10 locations were selected for this initiative.

However, on 7 December, a report by Prothom Alo revealed that irregularities in the appointment of dealers or distributors for the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) had not been fully eradicated. During previous administrations, political affiliation often influenced dealer appointments, and similar biases affected the allocation of 'poor cards'. When new appointments were made, advertisements were also not issued, limiting opportunities for many to apply, especially for those who were politically excluded in the past.

It is noteworthy that there are 8,273 TCB distributors in the country. These distributors sell essential items such as edible oil, lentils, and rice at discounted prices to cardholders. A cardholder gets two liters of edible oil for Tk 100 per kg, two kg of lentils for Tk 60 per kg and five kg of rice for Tk 30 per kg. They receive a commission of Tk 5 per kilogram sold.

Tariffs are reduced, but prices don't fall

In the second half of the year, the government took additional steps to lower egg and sugar prices by reducing tariffs and increasing imports. On 9 October, the National Board of Revenue lowered the sugar import tariff from 30 per cent to 15 per cent. This led to a reduction of Tk 11.18 per kg for raw sugar and Tk 14.26 per kg for refined sugar. Despite these measures, prices of these goods did not fall significantly.

Former professor at the Economics Department of Dhaka University, Barkat-e-Khuda, speaking to Kaler Kantho on 18 September, said, "Inflation could only be controlled if supply-side issues were addressed. Despite adequate supply, the market was being manipulated by syndicates, causing artificial price hikes. Tackling these syndicates and restoring accurate information was crucial to controlling inflation."

Declining commitment to reducing inequality

At the 2024 annual conference of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) on 7 December, a message emerged regarding the impact of national economic and labour market struggles. World Bank senior economist Sergio Olivieri revealed that one in five families—about 20 per cent of households—is at risk of falling into poverty. This situation has been exacerbated by both internal and external economic challenges since 2022, with rising food prices posing a significant challenge for policymakers. According to Olivieri, sustainable solutions require a focus on increasing incomes for the lower strata of society, with recommendations for investment in quality education, development of supply chain infrastructure, and expanding social protection programmes.

In the same session, renowned economist Rehman Sobhan highlighted the growing inequality in the country, emphasizing that state policies were contributing to this inequality. (Prothom Alo, 8 December 2024)

When World Bank economists were suggesting increase wages of marginal workers, at that time, a report by the International Labour Organization (ILO) indicated that Bangladesh ranks third among South Asian countries for having the highest proportion of low-wage workers.

According to the ILO's Global Wage Report for 2024-2025, 11.2 per cent of workers in Bangladesh receive low wages, with only Sri Lanka (25.9 per cent) and Bhutan (13.8 per cent). By contrast, Pakistan has the lowest proportion of low-wage workers in the region (0.4%) and India (11.5 per cent).

In a related report by Oxfam in October, it was revealed that Bangladesh was one of the countries where labour rights were most violated, alongside Afghanistan, Jordan, and Zimbabwe.

The report further said in terms of formulating and implementing labour policies, Bangladesh ranks among the bottom 10 countries in the world. Bangladesh ranked 161st out of 164 countries. In addition, Bangladesh is also ranked among the bottom 10 countries. Bangladesh ranks the 155th in terms of workers' rights protection.

Moreover, Bangladesh's position in the commitment to reducing inequality index dropped 17 places in 2024, ranking 124th. This was a decline from its 117th position in 2022. In 2018, Bangladesh was ranked 148th, and in 2020, it ranked 113th.

(Daily Bonik Barta 22 October 2024)

Labour migration declines, remittance increases in 2024 SRS reports

Bangladesh is one of the top ten labour sending countries in the world. The labour migration, which is the lifeline of the country's economy, has decreased in 2024.

Despite no significant investment, the country receives over $20 billion dollars every year, which plays a significant role on the overall development of the country.

In 2024, the country received the highest amount of the remittances. Bangladeshis sent home nearly $27 billion in remittances. The amount was $21.94 billion in 2023.

A total of 1011,969 Bangladeshis have gone abroad for work in 2024. Of them, 61,158 are female migrants, according to the statistics of Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET). The BMET is a government agency which processes and regulates the labour migration.

In 2024, most of the migrants have gone to seven countries. A total of 628,564 migrants have gone to Saudi Arabia, 47,166 to UAE, 33,031 to Kuwait, 74,422 to Qatar, 15,413 to Jordan, 93,632 to Malaysia and 56,878 to Singapore.

In 2023, a total of 13,05,453 Bangladeshi migrants went abroad for work in 2023, according to the BMET. Of them, 76108 are women migrants.

A total of 4,97,674 migrants went to Saudi Arabia, 98,422 to UAE, 36,548 to Kuwait, 56,148 to Qatar, 8,626 to Jordan, 351,683 to Malaysia and 53,265 to Singapore. Besides, 10,383 migrants went to the United Kingdom and 16,879 migrants to Italy.

In 2024, over 1000 women migrant workers have gone to five countries. A total of 40,315 women migrants have gone to Saudi Arabia, 1036 women migrants to UAE, 2331 to Qatar, 13772 to Jordan and 1483 to United Kingdom.

In 2023, a total of 50,254 women migrants have gone to Saudi Arabia, 2000 to UAE, 1095 to Qatar, 7,838 to Jordan and 5,256 to United Kingdom.

Sources from where migration is higher are: Comilla (9.05pc), Brahmanbaria (5.88pc), Tangail (4.55pc), Chandpur (4.02pc), Kishoreganj (4.01pc), Chittagong (3.81pc), Narsingdi (3.33pc), Dhaka (3.30pc), and others.

In a report titled 'the trends and nature of labour migration' from Bangladesh in 2024 launched recently, Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) said labour migration

has been halted to several countries. There has been no migration this year to countries such as Oman, Bahrain, the United Arab Emirates, and the Maldives.

In Italy, labour migration activities have stopped due to counterfeit documents, while in Serbia, the migration process is at a standstill because the application server is malfunctioning.

BMET categorizes migrant workers into four groups based on skill levels: professional, skilled, semi-skilled, and low-skilled workers. Doctors, engineers, architects, teachers, accountants, computer operators, pharmacists, nurses, foremen, diploma engineers, paramedics, and salespeople are considered professionals. Mechanics, welders, craftsmen, electricians, painters, cooks, drivers, plumbers, garment workers, and certified caregivers are considered skilled workers. Farmers, gardeners, and those working as assistants in garment factories and shops are considered semi-skilled workers. Cleaners, domestic workers, and manual laborers are classified as low-skilled workers.

Bangladesh mainly participates in the semi-skilled and low-skilled labour markets. In 2024, among those who migrated for work (41,621 people), 4.59 per cent were professionals (214,044 people), 23.62 per cent were skilled, 17.56 per cent were semi-skilled (159,128 people), and 54.23 per cent were low-skilled workers (491,480 people).

A 12-member committee led by Dr. Debapriya Bhattacharya has prepared a white paper on the state of Bangladesh's economy in 2024.

According to the report, Bangladeshi migrants are trapped in the less and semi-skilled market.

BMET has 110 Technical Training Centers (TTC) which provide training on 55 vocations. 46 TTCs offer language training375. Unfortunately, there is little evidence of success in accessing overseas employment for those in receipt of training from the TTCs. Challenges to accessing the skilled labour market are manifold. The lack of employability overseas of TTC trainees (Iqbal and Matin,

2024) deters potential migrants from acquiring skills.

Most importantly, recruiting agencies are not interested in promoting skilled migration. This is because they can extract more profit and avoid accountability by processing the migration of unskilled workers.

Former director at BMET, Nurul Islam, said Bangladesh can earn over $30 billion by sending skilled migrants.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) in a report launched on 28 December has given various suggestions to the interim government to establish good governance in the migration process.

In order to protect the rights of both short-term migrants and long-term immigrants, at least 1 per cent of the national budget should be allocated to this sector.

Over the past 15 years, the number of Technical Training Centres (TTCs) has been doubled (to 110), without any feasibility study or consideration of funding sources. Furthermore, those receiving training are unable to go abroad. These centers need to be evaluated and made more effective. Recruiting agencies should be made accountable for bringing skilled worker visas.

Efforts should be made to end modern-day slavery in female migration and ensure safe employment opportunities. Legal assistance should be provided to abused and unemployed female migrants, along with psychosocial services, safe homes in destination countries, and care for children born as a result of sexual abuse.

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

৫/৬ এ, স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০

info@safetyandrights.org
safetyandrights.org
Safety and Rights Society
Safety and Rights Society